রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট্, কলিকাতা।
প্রকাশক শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

সে

প্রথম সংস্করণ .. বৈশাখ, ১৩৪৭

মূল্য—৩.

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন (বীরভূম)।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
করতলযুগলেষু

মেঘের ফুরোল কাজ এইবার।
সময় পেরিয়ে দিয়ে ঢেলেছিল জলধার,
সুদীর্ঘ কালের পরে নিল ছুটি।
উদাসী হাওয়ার সাথে জুটি'
রচিছে যেন সে অন্যমনে
আকাশের কোণে কোণে
ছবির খেয়াল রাশি রাশি,
মিলিছে তাহার সাথে হেমন্তে কুয়াশা-ছোঁওয়া হাসি।
দেব পিতামহ হাসে স্বর্গের কর্ম্মের হেরি হেলা,
ইন্দ্রের প্রাঙ্গণতলে দেবতার অর্থহীন খেলা।

আমারো খেয়াল ছবি মনের গহন হোতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে।
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে
যায় সে হারায়ে
নিরুদ্দেশে
বাউলের বেশে।

যেথা আছে খ্যাতিহীন পাড়া
সেথায় সে মুক্তি পায় সমাজ-হারানো লক্ষ্মীছাড়া।
যেমন-তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা,
দিলেম উজাড় করি' ঝুলি।
লও যদি লও তুলি',
রাখো ফেলো যাহা ইচ্ছা তাই—
কোনো দায় নাই।

ফসল কাটার পরে
শূন্য মাঠে তুচ্ছ ফুল ফোটে অগোচরে
আগাছার সাথে।
এমন কি আছে কেউ যেতে যেতে তুলে নেবে হাতে—
যার কোনো দাম নেই
নাম নেই,
অধিকারী নাই যার কোনো,
বনশ্রী মর্য্যাদা যারে দেয়নি কখনো॥

পৌষ, ১৩৪৩
শান্তিনিকেতন

সে

১

বিধাতা লক্ষলক্ষ কোটিকোটি মানুষ সৃষ্টি করে চলেছেন তবু মানুষের আশা মেটে না, বলে, আমরা নিজে মানুষ তৈরি করব। তাই দেবতার সজীব পুতুল-খেলার পাশাপাশি নিজের খেলা সুরু হোলো পুতুল নিয়ে, সেগুলো মানুষের আপন-গড়া মানুষ। তারপরে ছেলেরা বলে গল্প বলো, তার মানে, ভাষায়-গড়া মানুষ বানাও। গড়ে উঠল কত রাজপুত্তুর, মন্ত্রীরপুত্তুর, সুয়োরাণী, দুয়োরাণী, মৎস্য-নারীর উপাখ্যান, আরব্য উপন্যাস, রবিন্‌সন্ ক্রুসো। পৃথিবীর জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চল্‌ল। বুড়োরাও আপিসের ছুটির দিনে বলে, মানুষ বানাও,—হোলো আঠারো পর্ব্ব মহাভারত প্রস্তুত। আর লেগে গিয়েছেন গল্প-বানিয়ের দল, দেশে দেশে।

নাৎনীর ফরমাসে কিছুদিন থেকে লেগেছি মানুষ গড়ার কাজে; নিছক খেলার মানুষ, সত্য মিথ্যের কোনো জবাবদিহি নেই। গল্প যে শুনছে তার বয়স ন'বছর, আর যে শোনাচ্ছে সে সত্তর পেরিয়ে গেছে। কাজটা একলাই

সুরু করেছিলুম, কিন্তু মালমসলা এতই হাল্‌কা ওজনের, যে, নির্বিচারে পুপুও দিল যোগ। আর একটা লোককে রেখেছিলুম, তার কথা হবে পরে।

অনেক গল্প সুরু হয়েছে এই ব'লে যে, এক যে ছিল রাজা। আমি আরম্ভ ক'রে দিলুম এক যে আছে মানুষ। তারপরে লোকে যাকে বলে গপ্‌পো, এতে তারো কোনো আঁচ নেই। সে মানুষ ঘোড়ায় চ'ড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে গেল না। একদিন রাত্রি দশটার পর এল আমার ঘরে। আমি বই পড়ছিলুম। সে বললে, দাদা, ক্ষিদে পেয়েছে।

রাজপুত্তুরের গল্প অনেক শুনেছি ; কখনোই তার ক্ষিদে পায় না। কিন্তু এর ক্ষিদে পেয়ে গেল গোড়াতেই, শুনে খুসি হলুম। ক্ষিদে-পাওয়া লোকের সঙ্গে ভাব করা সহজ। খুসি করবার জন্যে গলির মোড়ের থেকে বেশি দূর যেতে হয় না।

দেখলুম, লোকটার দিব্যি খাবার সখ। ফরমাস করে মুড়োর ঘণ্ট, লাউ-চিংড়ি, কাঁটাচচ্চড়ি ; বড়ো বাজারের মালাই পেলে বাটিটা চেঁচেপুঁছে খায়। এক-একদিন সখ যায় আইস্‌ক্রিমের। এমন ক'রে খায় সে দেখবার যোগ্য। মজুমদারদের জামাইবাবুর সঙ্গে অনেকটা মেলে।

একদিন ঝমাঝম বৃষ্টি। বসে বসে ছবি আঁকছি। এখানকার মাঠের ছবি। উত্তরদিকে বরাবর চলে গেছে রাঙা মাটির রাস্তা,—দক্ষিণ দিকে পোড়ো জমি, উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো, মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া বুনো খেজুর। দূরে দুটো চারটে তালগাছ আকাশের দিকে কাঙালের মতো তাকিয়ে। তারি পিছনে জমে উঠেছে ঘন মেঘ, যেন একটা প্রকাণ্ড নীল বাঘ ওৎ পেতে আছে, কখন্ একলাফে মাঝ আকাশে উঠে সূর্য্যটাকে দেবে থাবার ঘা। বাটিতে রং গুলে' তুলি বাগিয়ে এই সব এঁকে চলেছি।

দরজায় পড়ল ঠেলা। খুলে দেখি ডাকাত নয়, দৈত্য নয়, কোটালের পুত্তুর নয়—সেই লোকটা। সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে জল ঝরছে, ময়লা ভিজে জামা
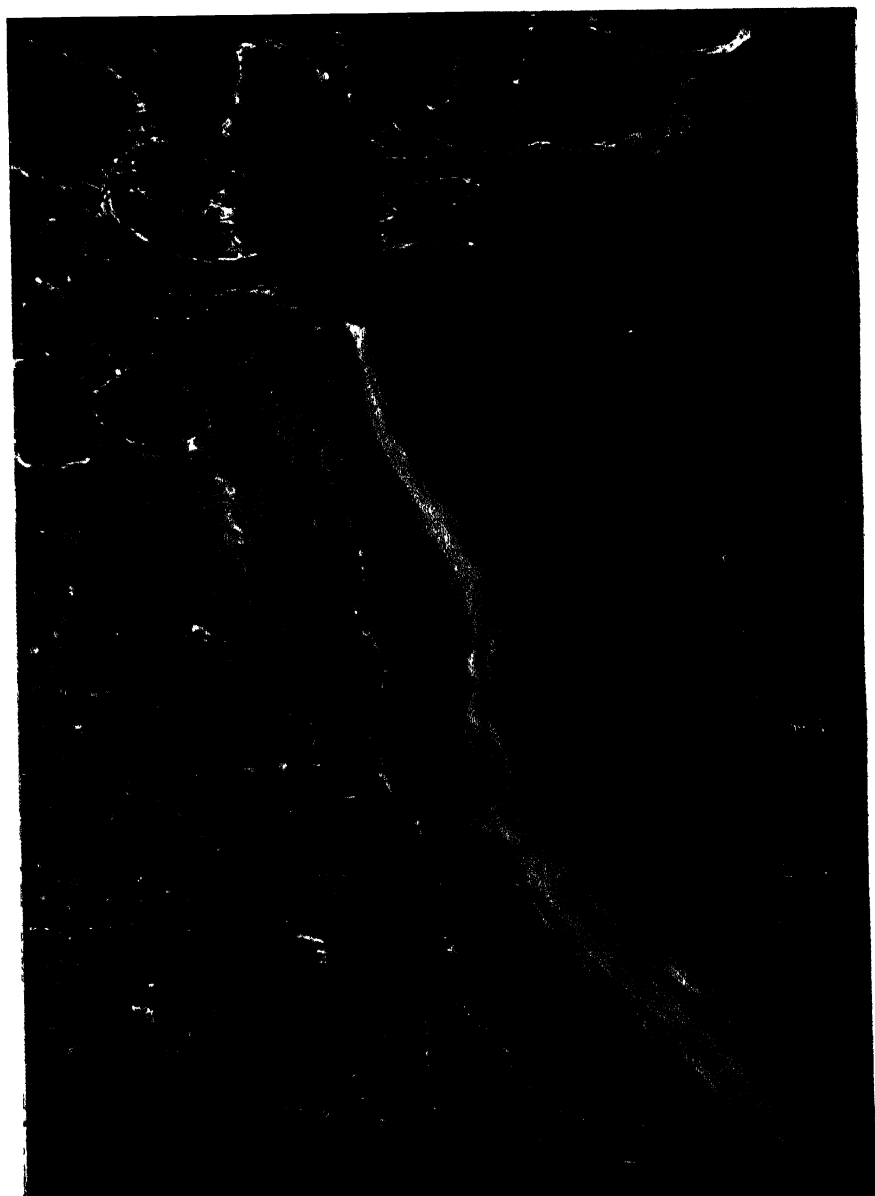
গায়ে লেপ্‌টে গেছে, কোঁচার ডগায় কাদা, জুতোয় কাদার পিণ্ডি। আমি বললুম, এ কী!

সে বললে, যখন বেরিয়েছিলুম খট্‌খটে রোদ্দুর। আদ্ধেক পথে আসতে বৃষ্টি নামল। তোমার ঐ বিছানার চাদরটা যদি দাও, তো, কাপড় ছেড়ে গায়ে জড়িয়ে বসি।

হুকুম পাবার সবুর সইল না। চট্‌ ক'রে খাটের থেকে লক্ষ্ণৌ ছিটের ঢাকাটা টেনে নিয়ে তাই দিয়ে মাথাটা মুছে কাপড় ছেড়ে সেটা গায়ে জড়িয়ে বসল। ভাগ্যিস কাশ্মীরি জামিয়ারটা পাতা ছিল না।

বললে, দাদা, তোমাকে একটা গান শোনাব।

কী করি, ছবি-আঁকা বন্ধ করতে হোলো।

সে সুরু করলে—

ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে
নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে।

আমার মুখের ভাব দেখে তার কী সন্দেহ হোলো জানিনে, জিগেস করলে, কেমন লাগছে?

আমি বললুম, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তোমাকে গলা সাধতে হবে লোকালয় থেকে দূরে ব'সে। তারপরে বুঝে নেবেন চিত্রগুপ্ত, যদি সইতে পারেন।

সে বললে, পুপেদিদিও হিন্দুস্থানি ওস্তাদের কাছে গান শেখে, সেইখানে আমাকে বসিয়ে দিলে কেমন হয়।

আমি বললুম, পুপেদিদিকে যদি রাজি করাতে পারো তা হোলে কথা নেই।

সে বললে, পুপেদিদিকে আমি বড়ো ভয় করি।

এই পর্য্যন্ত শুনে আমার শ্রোতা পুপেদিদি খুব হেসে উঠল। তাকে কেউ ভয় করে এতে সে ভারি খুসি। যেমন খুসি হয় জগতের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের দল।

দয়াময়ী আশ্বাস দিয়ে বললে, ভয় নেই, আমি তাকে কিছু বলব না।

আমি বললুম, তোমাকে ভয় কে না করে! দুবেলা দু বাটি ক'রে দুধ খাও—গায়ে কী রকম জোর! মনে আছে তো তোমার হাতে লাঠি দেখে সেই বাঘটা ল্যাজ গুটিয়ে একেবারে নুটুপিসির বিছানার নিচে গিয়ে লুকিয়েছিল।

বীরাঙ্গনা ভারি খুসি। মনে করিয়ে দিলে ভালুকটার কথা—সে পালাতেঁ গিয়ে পড়ে গিয়েছিল নাবার ঘরের স্নানের জলের টবের মধ্যে।

সেই যে মানুষটার ইতিহাস গড়ে উঠেছিল আমার একলার হাতে এখন থেকে পুপেও তাতে যেখানে সেখানে জোড়া দিতে লাগল। আমি যদি বা বলি, একদিন বেলা তিনটার সময় সে এসেছিল আমার কাছে দাড়ি কামাবার ক্ষুর চেয়ে নিতে, আর নিতে খালি-বিস্কুটের টিন, পুপে খবর দেয় সে ওর কাছ থেকে নিয়ে গেছে পশম বোনবার কুরুস্‌কাটি।

সব গল্পেরই একটা আরম্ভ আছে, শেষ আছে, কিন্তু ঐ যে "এক যে আছে মানুষ" তার আর শেষ নেই। তার দিদির জ্বর হয়, ডাক্তার ডাকতে যায়। টমি কুকুর আছে, বেড়ালের নখের আঁচড় লেগে তার নাক যায় ছ'ড়ে। পিছন দিক থেকে গোরুর গাড়ির উপর চ'ড়ে বসেছিল, তাই নিয়ে গাড়োয়ানের সঙ্গে হয় বিষম বচসা। উঠোনে কলতলায় পিছলে প'ড়ে বামুন ঠাক্‌রুণের মাটির ঘড়া দেয় ভেঙে। মোহনবাগানের ফুটবল্‌ ম্যাচ্‌ দেখতে গিয়েছিল, পকেট থেকে সাড়ে তিনআনা পয়সা কে নেয় তুলে। ফির্‌তি রাস্তায় ভীমনাগের দোকান থেকে সন্দেশ কেনা বাদ গেল। বন্ধু আছে কিনু চৌধুরী, তার ওখানে গিয়ে কুচো চিংড়ি ভাজা আর আলুর দম ফরমাস করে। এমনি

একটার পর একটা চলছে দিনের পর দিন। এর সঙ্গে পুপে জুড়েছে, কোনো-দিন দুপুর বেলায় ওর ঘরে গিয়ে বলেছে, মায়ের আলমারি থেকে পাকপ্রণালীর বই খানা খুঁজে বের করতে, বন্ধু সুধাকান্ত বাবু শিখতে চায় মোচার ঘণ্ট তৈরি করা। আর একদিন পুপের সুবাসিত নারিকেল তেল নিয়ে গেল চেয়ে, ভয় হয়েছে মাথায় টাক প'ড়ে আসছে দেখে। আর একদিন দিন্‌দার ওখানে গান শুনতে গেল, দিন্‌দা তখন তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ঘুমিয়ে।

এই যে আমাদের এক যে আছে মানুষ, এর একটা নাম নিশ্চয়ই আছে। সে কেবল আমরা দুজনেই জানি, আর কাউকে বলা বারণ। এই-খানটাতেই গল্পের মজা। এক যে ছিল রাজা, তারও নাম নেই, রাজপুত্র, তারও নেই, আর রাজকন্যা, যার চুল লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, যার হাসিতে মাণিক, চোখের জলে মুক্তো তারও নাম কেউ জানে না। ওরা নামজাদা নয় অথচ ঘরে ঘরে ওদের খ্যাতি।

এই যে আমাদের মানুষটি—এ'কে আমরা শুধু বলি "সে"। বাইরের লোক কেউ নাম জিগেস করলে আমরা দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে হাসি। পুপে বলে আন্দাজ ক'রে বলো দেখি, প দিয়ে আরম্ভ। কেউ বলে প্রিয়নাথ, কেউ বলে পঞ্চানন, কেউ বলে পাঁচকড়ি, কেউ বলে পীতাম্বর, কেউ বলে পরেশ, কেউ বলে পীটার্স, কেউ বলে প্রেস্কট্, কেউ বলে পীরবক্স, কেউ বলে পীয়ার খাঁ।

এইখানে এসে কলম থামতেই একজন বললে, গল্প চলবে তো?

কার গল্প? এ তো রাজপুত্তুর নয়, এ হোলো মানুষ, এ খায় দায় ঘুমোয়, আপিসে যায়, সিনেমা দেখবারও সখ আছে। দিনের পর দিন যা সবাই করছে তাই এর গল্প। মনের মধ্যে যদি মানুষটাকে স্পষ্ট ক'রে গ'ড়ে তোলো তাহোলে দেখতে পাবে এ যখন দোকানের রোয়াকে ব'সে রসগোল্লা

খায় আর তার রস ঠোঙার ছিদ্র দিয়ে অজানিতে পড়তে থাকে তার ময়লা ধুতির উপর, সেটাই গল্প। যদি জিগেস করো, তারপরে? তাহোলে বলব, তারপরে ও ট্রামে চড়ে বসল, হঠাৎ জ্ঞান হোলো পয়সা নেই, টপ্‌ ক'রে লাফিয়ে পড়ল। তারপরে? তারপরে এই রকমই আরো কত কী, 'বড়োবাজার থেকে বহুবাজার, বহুবাজার থেকে নিমতলা।'

ওদের মধ্যে একজন বললে, যা সৃষ্টিছাড়া, বড়োবাজারে বহুবাজারে এমন কি নিমতলাতেও যার গতি নেই, তা নিয়ে কি গল্প হয় না?

আমি বললুম, যদি হয় তাহোলেই হয়, না হোলে হয়ই না।

সে বললে, হোক্‌ তবে। হোক্‌ না, একেবারে যা-ইচ্ছে তাই; মাথা নেই, মুণ্ডু নেই, মানে নেই মোদ্দা নেই এমন একটা কিছু।

এটা হোলো স্পর্দ্ধা। বিধাতার সৃষ্টি, নিয়মের রসারসি দিয়ে ক'ষে বাঁধা, যেটা হবার সেটা হবেই। এ তো সহ্য হয় না। একঘেয়ে বিধানের সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহকে এমন ক্ষেত্রে ঠাট্টা ক'রে নেওয়া যাক্‌ যেখানে শাস্তির ভয় নেই। এ তো তাঁর নিজের এলেকা নয়।

আমাদের "সে" ছিল কোণে ব'সে। কানে কানে বললে, দাদা, লেগে যাও। আমার নাম দিয়ে যা-খুসি চালিয়ে দিতে পারো, ফৌজদারী করব না।

"সে" মানুষটির পরিচয় দেওয়ার দরকার আছে।

পুপুদিদিমণিকে ধারা বেয়ে যে গল্প ব'লে যাচ্চি সেই গল্পের মূল অবলম্বন হচ্চে একটি সর্ব্বনামধারী "সে", কেবলমাত্র বাক্য দিয়ে তৈরি। সেইজন্যে এ'কে নিয়ে যা-তা করা সম্ভব, কোনোখানে এসে কোনো প্রশ্নের হুঁচোট খাবার আশঙ্কা নেই। কিন্তু অনাসৃষ্টির চাক্ষুষ প্রমাণ দেবার জন্যে একজন শরীরধারী জোগাড় করতে হয়েছে। সাহিত্যের মামলায় কেস্‌টা যখনি বড়ো বেশি বেসামাল হয়ে পড়ে, তখনি এ লোকটা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। কিছুই বাধে না। আমার মতো মোক্তারের ইসারা পেলেই সে

অম্লানমুখে বলতে পারে যে, কাঁচড়াপাড়ার কুম্ভমেলায় গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে কুমীরে ধরেছিল তার টিকির ডগা। সেটা গেল তলিয়ে, বোঁটা-ছেঁড়া মানব-দেহের বাকি অংশটুকু উঠে এসেছে ডাঙায়। আরও একটু চোখ টিপে দিলে সে নির্লজ্জ হয়ে বলতে পারে, মানোয়ারী জাহাজের ডুবুরি গোরা সাতমাস পাঁক ঘেঁটে গোটা পাঁচ ছয় চুল ছাড়া বাকি টিকিটা উদ্ধার করে এনেছে, বকশিষ পেয়েছে এককালীন সোয়া তিনটাকা। পুপুদিদি তবু যদি বলে, তারপরে, তাহোলে তখনি সুরু করবে, নীলরতন ডাক্তারের পায়ে ধরে বললে, দোহাই ডাক্তারবাবু, ওষুধ দিয়ে টিকিটা জোড়া দিয়ে লাগিয়ে দাও, নইলে তেলোর কাছে প্রসাদী ফুল বাঁধতে পারছিনে। তিনি সন্ন্যাসীদত্ত বজ্রজটী মলম লাগিয়ে দিতেই টিকিটা একেবারে মরিয়া হয়ে বেড়ে চলেছে, অফুরান একটা কেঁচোর মতো। পাগড়ি পরলে পাগড়িটা বেলুনের মতো ফেঁপে উঠতে থাকে, মাথার বালিশটার উপর চূড়ো তৈরি হোতে থাকে দৈত্যপুরীর ব্যাঙের ছাতার মতো। বাঁধা মাইনে দিয়ে নাপিত রাখতে হোলো। প্রহরে প্রহরে তাকে দিয়ে ব্রহ্মতালু চাঁচিয়ে নিতে হচ্চে।

তবু যদি শ্রোতার কৌতূহল না মেটে তাহোলে সে করুণ মুখ ক'রে বলতে থাকে যে, মেডিক্যাল কলেজের সার্জন জেনেরাল হাতের আস্তিন গুটিয়ে বসেছিল, তার ভীষণ জেদ মাথার ঐ জায়গাটাতে ইস্ক্রুপ দিয়ে ফুটো ক'রে সেইখানে রবারের ছিপি এঁটে গালা লাগিয়ে সিলমোহর ক'রে দেবে, ইহকাল পরকালে ওখান দিয়ে আর টিকি গজাতে পারবে না। চিকিৎসাটা ইহকাল ডিঙিয়ে পরকালেই গিয়ে ঠেকবে এই আশঙ্কায় ও কোনোমতেই রাজি হোলো না।

আমাদের এই "সে" পদার্থটি ক্ষণজন্মা বটে ; এমনতরো কোটিকে গোটিক মেলে। মিথ্যে কথা বানাতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভা। আমার আজগবি গল্পের এতবড়ো উত্তরসাধক ওস্তাদ বহুভাগ্যে জুটেছে। গল্প-প্রশ্নের উত্তরপাড়ার

এই যে মানুষ, মাঝে মাঝে এ'কে পুপুদিদির কাছে এনে হাজির করি,—দেখে তার বড়ো চোখ আরো বড়ো হয়ে ওঠে। খুসি হয়ে বাজার থেকে গরম জিলিপি এনে খাইয়ে দেয়।—লোকটা অসম্ভব জিলিপি ভালোবাসে আর ভালোবাসে শিকদারপাড়া গলির চম্‌চম্‌। পুপুদিদি জিগেস করে, তোমার বাড়ি কোথায়? ও বলে, কোন্‌নগরে, প্রশ্নচিহ্নের গলিতে।

নাম বলিনে কেন? নাম বললে ইনি যে কেবলমাত্র ইনিতেই এসে ঠেকবেন এই ভয়। জগতে আমি আছি একজন মাত্র, তুমিও তাই, সেই তুমি আমি ছাড়া আর সকলেই তো সে। আমার গল্পের সকল 'সে'-র উনি জামিন।

একটা কথা ব'লে রাখি, নইলে অধর্ম্ম হবে। ওকে মাঝে রেখে যে পালা জমানো হয়েছে তার থেকে যারা বিচার করে তারা ভুল করে; যারা তাকে চাক্ষুষ দেখেছে তারা জানে লোকটা সুপুরুষ, চেহারা সুগম্ভীর। রাত্তিরে যেমন তারার আলোর ছড়াছড়ি, ওর গাম্ভীর্য্য তেমনি চাপা হাসিতে ভরা। ও পয়লা নম্বরের মানুষ, তাই কোনো ঠাট্টা মস্‌করায় ওকে জখম করতে পারে না। ওকে বোকার মতো সাজাতে আমার মজা লাগে, কেননা ও আমার চেয়ে বুদ্ধিমান। অবুঝের ভান করলেও ওর মান হানি হয় না: সুবিধে হয়, পুপুর স্বভাবের সঙ্গে ওর মিল হয়ে যায়।

২

এর মধ্যে পুপেদিদি গেছে দার্জিলিঙে। "সে" রইল মাথাঘষা গলিতে একলা আমার জিম্মায়। তার ভালো লাগছে না। আমিও জ্বালাতন হয়েছি। বলে, আমাকে দার্জিলিং পাঠাও। আমি বললুম, কেন ?

সে বললে—পুরুষ মানুষ বেকার বসে আছি, আত্মীয়-স্বজন ভারি নিন্দে করছে।

কী কাজ করবে, বলো।

পুপেদিদির খেলার রান্নার জন্যে খবরের কাগজ কুচিকুচি করে দেব।

এত মেহন্নত সইবে না। একটু চুপ করো দেখি। আমি এখন হুঁহাউ দ্বীপের ইতিহাস লিখছি।

হুঁহাউ নামটা শোনাচ্চে ভালো দাদা। ওটা তোমার চেয়ে আমার কলমেই মানাত ঠিক। বিষয়টার একটু আমেজ দিতে পারো কি ?

ঠাট্টা নয়, বিষয়টা গম্ভীর, কলেজে পাঠ্য হবার আশা রাখি। একদল বৈজ্ঞানিক ঐ শূন্য দ্বীপে বসতি বেঁধেছেন। খুব কঠিন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত।

একটুখানি বুঝিয়ে বলো—কী করছেন তাঁরা ? হাল নিয়মে চাষবাস করছেন ?

একেবারে উল্টো, চাষের সম্পর্ক নেই।

আহারের কী ব্যবস্থা ?

একেবারেই বন্ধ।

প্রাণটা ?

সেই চিন্তাটাই সবচেয়ে তুচ্ছ। পাকযন্ত্রের বিরুদ্ধে ওঁদের সত্যাগ্রহ। বলছেন, ঐ জঠর যন্ত্রটার মতো প্যাঁচাও জিনিষ আর নেই। যত রোগ যত যুদ্ধ-বিগ্রহ যত চুরি ডাকাতির মূল কারণ তার নাড়ীতে নাড়ীতে।

দাদা, কথাটা সত্য হোলেও হজম করা শক্ত।

তোমার পক্ষে শক্ত। কিন্তু ওঁরা হলেন বৈজ্ঞানিক। পাকযন্ত্রটা উপড়ে ফেলেছেন, পেট গেছে চুপ্‌সে, আহার বন্ধ, নস্য নিচ্চেন কেবলি। নাক দিয়ে পোষ্টাই নিচ্চেন হাওয়ায় শুষে। কিছু পৌঁছচ্চে ভিতরে, কিছু হাঁচতে হাঁচতে বেরিয়ে যাচ্চে। দুই কাজ একসঙ্গেই চলছে, দেহটা সাফও হচ্চে, ভর্ত্তিও হচ্চে।

আশ্চর্য্য কৌশল! কলের জাঁতা বসিয়েছেন বুঝি। হাঁস মুরগি পাঁটা ভেড়া আলু পটল একসঙ্গে পিষে শুকিয়ে ভর্ত্তি করছেন ডিবের মধ্যে!

না। পাকযন্ত্র, কসাইখানা, দুটোই সংসার থেকে লোপ করা চাই। পেটের দায়, বিল-চোকানোর ল্যাঠা একসঙ্গে মেটাবেন। চিরকালের মতো জগতে শান্তি-স্থাপনার উপায় চিন্তা করছেন।

নস্যটা তবে শস্য নিয়েও নয়, কেননা সেটাতেও কেনাবেচার মামলা।

বুঝিয়ে বলি। জীবলোকে উদ্ভিদের সবুজ অংশটাই প্রাণের গোড়াকার পদার্থ সেটা তো জানো।

পাপমুখে কেমন করে বলব যে জানি, কিন্তু বুদ্ধিমানেরা নিতান্ত যদি জেদ করেন তাহোলে মেনে নেব।

দ্বৈপায়ন পণ্ডিতের দল ঘাসের থেকে সবুজ সার বের করে নিয়ে সূর্য্যের বেগ্‌নি-পেরোনো আলোয় শুকিয়ে মুঠো মুঠো নাকে ঠুসছেন। সকালবেলায় ডান নাকে, মধ্যাহ্নে বাঁ নাকে, সায়াহ্নে দুই নাকে একসঙ্গে, সেইটেই বড়ো ভোজ। ওঁদের সমবেত হাঁচির শব্দে চমকে উঠে পশুপক্ষীরা সাঁৎরিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেছে।

শোনাচ্চে ভালো। অনেকদিন বেকাব আছি দাদা, পাকযন্ত্রটা হন্যে হয়ে উঠেছে—তোমাদের ঐ নস্যটার দালালি করতে পারি যদি নিয়ুমার্কেটে, তাহোলে—

অল্প একটু বাধা পড়েছে সে কথা পবে বলব। তাঁদেব আব একটা মত আছে। তাঁরা বলেন, মানুষ দু পায়ে খাড়া হয়ে চলে ব'লে তাদের হৃদযন্ত্র পাকযন্ত্র ঝুলে ঝুলে মরছে, অস্বাভাবিক অত্যাচাব ঘটেছে লাখো লাখো বৎসর ধ'রে। তার জবিমানা দিতে হচ্চে আয়ুক্ষয় ক'বে। দোলায়মান হৃদয়টা নিয়ে মরছে নরনারী। চতুষ্পদেব কোনো বালাই নেই।

বুঝলুম, কিন্তু উপায় ?

ওঁরা বলছেন, প্রকৃতিব মূল মৎলবটা শিশুদেব কাছ থেকে শিখে নিতে হবে। সেই দ্বীপেব সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ে শিলালিপিতে অধ্যাপক খুদে রেখেছেন—সবাই মিলে হামাগুড়ি দাও, ফিরে এসো চতুষ্পদী চালে, যদি দীর্ঘকাল ধবণীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও।

সাবাস ! আরো কিছু বাকি আছে বোধ হয়।

আছে। ওঁরা বলেন, কথা কওয়াটা মানুষের বানানো। ওটা প্রকৃতি-দত্ত নয়। ওতে প্রতিদিন শ্বাসেব ক্ষয় হোতে থাকে, সেই শ্বাসক্ষয়েই আয়ুক্ষয়। স্বাভাবিক প্রতিভায় এ কথাটা গোড়াতেই আবিষ্কার কবেছে বানব। ত্রেতা-যুগেব হনুমান আজো আছে বেঁচে। আজ ওরা নিরালায় বসে সেই বিশুদ্ধ আদিম বুদ্ধির অনুসরণ করছেন। মাটির দিকে মুখ ক'বে সবাই একেবারে চুপ। সমস্ত দ্বীপটাতে কেবল নাকের থেকে হাঁচির শব্দ বেবয়, মুখের থেকে কোনো শব্দই নেই।

পরস্পর বোঝাপড়া চলে কী ক'রে ?

অত্যাশ্চর্য্য ইসারার ভাষা উদ্ভাবিত।—কখনো ঢেঁকি-কোটার ভঙ্গীতে, কখনো হাতপাখা-চালানোর চালে, কখনো ঝোড়ো সুপুরি গাছের নকলে

—পৃঃ ১'
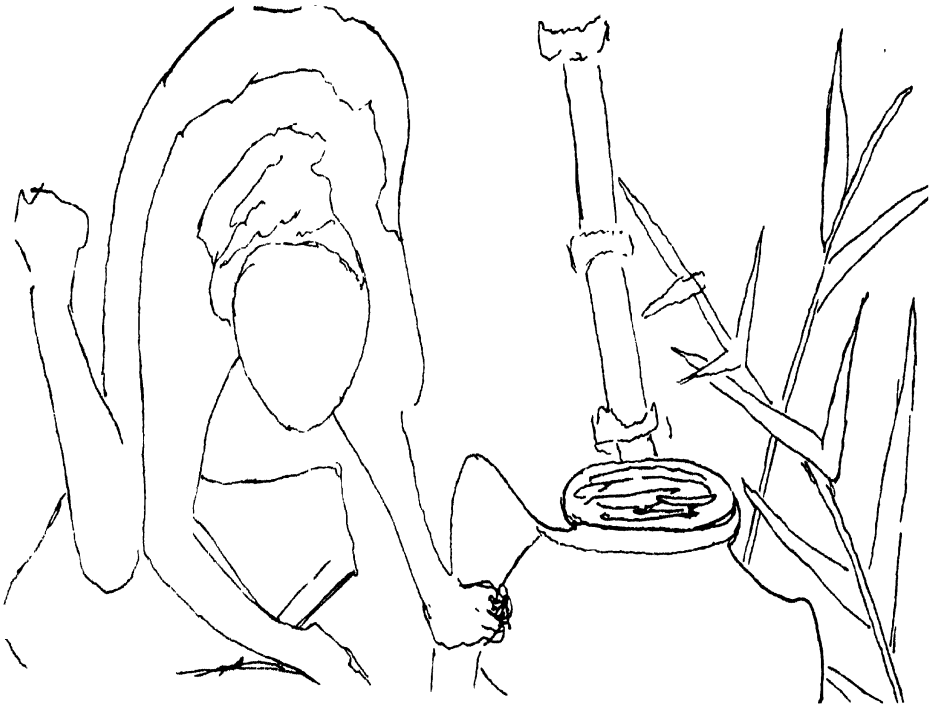
ডাইনে বাঁয়ে উপরে নিচে ঘাড় তুলিয়ে বাঁকিয়ে নাড়িয়ে কাঁপিয়ে হেলিয়ে ঝাঁকিয়ে। এমন কি সেই ভাষার সঙ্গে ভুরু-বাঁকানি চোখ-টেপানি যোগ ক'রে ওঁদের কবিতার কাজও চলে। দেখা গেছে তাতে দর্শকের চোখে জল আসে, নস্যির জায়গাটা বন্ধ হয়ে পড়ে।

কিছু টাকা আমাকে ধার দাও, দোহাই তোমার। ঐ হুঁহাউ দ্বীপেই যেতে হচ্ছে আমাকে। এত বড়ো নতুন মজাটা—

নতুন আর পুরোনো হোতে পেল কই। হাঁচতে হাঁচতে বস্তিটা বেবাক ফাঁক হয়ে গেছে। পড়ে আছে জালা জালা সবুজ নস্যি। ব্যবহার করবার যোগ্য নাক বাকি নেই একটাও।

এ তোমার আগাগোড়াই বানানো। বিজ্ঞানের ঠাট্টার পক্ষেও এটা বাড়াবাড়ি শোনাচ্চে। এই হুঁহাউ দ্বীপের ইতিহাস বানিয়ে তুমি পুপেদিদিকে তাক লাগিয়ে দিতে চাও। ঠিক করেছিলে তোমার এই অভাগা "সে"-নাম-ওয়ালাকেই বৈজ্ঞানিক সাজিয়ে সারা দ্বীপময় হাঁচিয়ে হাঁচিয়ে মারবে। বর্ণনা করবে, আমি ঘাড়-নাড়ানাড়ির ঘটা ক'রে ঘটোৎকচ বধ পাঁচালির আসর জমাচ্চি কী ক'রে। হয়তো কোন্ হামাগুড়িওয়ালি মনোহর ঘাড়-নাড়ানির সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে বসবে, ঘাড়-নাড়ামন্ত্রে কনে নাড়বে মাথা বাঁদিক থেকে ডানদিকে, আর আমি নাড়ব ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। সপ্তপদীগমন হয়ে উঠবে চতুর্দ্দশপদী। ওদের সেনেটহলে ঘাড়-নাড়া ভাষায় যখন ওরা সারে সারে পরীক্ষা দিতে বসেছে, তার মধ্যে আমাকেও বসাবে এক কোণে। আমার উপর তোমার দয়ামায়া নেই, দেবে ফেল করিয়ে। কিন্তু ওদের স্পোর্টিংক্লাবে হামাগুড়ি-রেসে আমাকেই পাওয়াবে ফার্ষ্ট্ প্রাইজ। ব'লে দিচ্চি, পুপেদিদিকে এমন ক'রে হাসাতে পারবে মনেও কোরো না।

বেশি বোকো না। চাণক্য পণ্ডিত শ্রেণীবিশেষের আয়ু-বৃদ্ধির জন্যে বলেছেন,

তাবচ্চ বাঁচতে মূর্খ যাবৎ ন বক্‌বকায়তে।

তুমি তো সংস্কৃত কিছু শিখেছিলে?

যতটা শিখেছিলেম, ভুলেছি তার দেড়গুণ ওজনে। নয়া-চাণক্য জগতের হিতের জন্যে যে উপদেশ দিয়েছেন সেটাও তোমার জানা দরকার, দাদা, ছন্দ মিলিয়েই লেখা :—

তখন্ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি যখন পণ্ডিৎ চুপায়তে।

চললুম, আমার শেষ পরামর্শ এই, বৈজ্ঞানিক রসিকতা ছেড়ে দিয়ে ছেলেমানুষি করো যতটা পারো।

এই কাহিনীটা পুপেদিদির কাছে একটুও পছন্দসই হয়নি। কপাল কুঁচকে বল্‌লে, এ কখনো হয়? নস্যি নিয়ে পেট ভরে?

আমি বল্‌লেম, গোড়াতে পেটটাকেই যে সরিয়ে দিয়েছে।

পুপুদিদি আশ্বস্ত হয়ে বল্‌লে, ওঃ তাই বুঝি।

শেষ পর্য্যন্ত ওর গিয়ে ঠেকল কথা না বলাতে। ওর প্রশ্ন, কথা না ব'লে কি বাঁচা যায়।

আমি বল্‌লুম, ওদের সব চেয়ে বড়ো পণ্ডিত ভূর্জ্জপাতায় লিখে লিখে দ্বীপময় প্রচার করেছেন, কথা ব'লেই মানুষ মরে। তিনি সংখ্যা গণনায় প্রমাণ করে দিয়েছেন, যারা কথা বল্‌ত সবাই মরেছে।

হঠাৎ পুপুদিদির বুদ্ধিতে প্রশ্ন উঠল—আচ্ছা বোবারা?

আমি বল্‌লেম, তারা কথা ব'লে মরেনি, তারা মরেছে কেউবা পেটের অসুখে, কেউবা কাশিসর্দ্দিতে।

শুনে পুপুদিদির মনে হোলো, কথাটা যুক্তিসঙ্গত।

আচ্ছা দাদামশায় তোমার কী মত?

আমি বল্‌লুম, কেউবা মরে কথা ব'লে, কেউবা মরে না ব'লে।

আচ্ছা তুমি কী চাও?

আমি ভাবছি, হুঁহাউ দ্বীপে গিয়ে বাস করব, জম্বুদ্বীপে বকিয়ে মারল আমাকে, আর পেরে উঠছিনে।

৩

শিবাশোধনসমিতির একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছে আমাদের সে। পুপুদিদির আসরে আজ সন্ধেবেলায় সেইটে পাঠ হবে।

রিপোর্ট

সন্ধেবেলায় মাঠে বসে গায়ে হাওয়া লাগাচ্চি এমন সময় শেয়াল এসে বল্‌লে, দাদা, তুমি নিজের কাচ্চাবাচ্চাদের মানুষ করতে লেগেছ, আমি কী দোষ করেছি?

জিজ্ঞাসা করলেম, কী করতে হবে শুনি।

শেয়াল বললে, না হয় হলুম পশু, তাই ব'লে কি উদ্ধার নেই? পণ করেছি, তোমার হাতে মানুষ হব।

শুনে মনে ভাবলুম, সৎকার্য্য বটে।

জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার এমন মৎলব হোলো কেন?

সে বল্‌লে, যদি মানুষ হোতে পারি তাহোলে শেয়াল-সমাজে আমার নাম হবে, আমাকে পূজো করবে ওরা।

আমি বল্‌লুম, বেশ কথা।

বন্ধুদের খবর দেওয়া গেল। তারা খুব খুসি। বল্‌লে, একটা কাজের মতো কাজ বটে। পৃথিবীর উপকার হবে। ক'জনে মিলে একটা সভা করলুম, তার নাম দেওয়া গেল, শিবা-শোধন-সমিতি।

পাড়ায় আছে অনেক কালের একটা পোড়ো চণ্ডীমণ্ডপ। সেখানে রোজ রাত্তির নটার পরে শেয়াল-মানুষ-করার পুণ্যকর্ম্মে লাগা গেল।

জিজ্ঞাসা করলুম, বৎস, তোমাকে জ্ঞাতিরা কী নামে ডাকে? শেয়াল বল্‌লে, "হৌ-হৌ"।

আমরা বললুম, ছি ছি, এ তো চলবে না। মানুষ হোতে চাও তো প্রথমে নাম বদলাতে হবে, তার পরে রূপ। আজ থেকে তোমার নাম হোলো শিবুরাম।

সে বল্‌লে, আচ্ছা। কিন্তু মুখ দেখে বোঝা গেল, হৌ-হৌ নামটা তার যে-রকম মিষ্টি লাগে শিবুরাম তেমন লাগল না। উপায় নেই, মানুষ হোতেই হবে।

প্রথম কাজ হোলো তাকে দু'পায়ে দাঁড় করানো। অনেক দিন লাগল। বহুকষ্টে নড়বড় করতে করতে চলে, থেকে থেকে পড়ে পড়ে যায়। ছ-মাস গেল দেহটাকে কোনো মতে খাড়া রাখতে। থাবাগুলো ঢাকবার জন্য পরানো হোলো জুতো মোজা দস্তানা।

অবশেষে আমাদের সভাপতি গৌর গোঁসাই বললেন, শিবুরাম, এইবার আয়নায় তোমার দ্বিপদী ছন্দের মূর্ত্তিটা দেখো দেখি, পছন্দ হয় কিনা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে ঘাড় বেঁকিয়ে, শিবুরাম অনেকক্ষণ ধরে দেখলে। শেষকালে বল্‌লে, গোঁসাইজি এখনো তোমার সঙ্গে তো চেহারার মিল হচ্চে না।

গোঁসাইজি বল্‌লেন, শিবু, সোজা হোলেই কি হোলো? মানুষ হওয়া এত সোজা নয়, বলি ল্যাজটা যাবে কোথায়, ওটার মায়া কি ত্যাগ করতে পারো?

শিবুরামের মুখ গেল শুকিয়ে। শেয়ালপাড়ায় দশবিশ গাঁয়ের মধ্যে ওর ল্যাজ ছিল বিখ্যাত।

সাধারণ শেয়ালরা ওর নাম দিয়েছিল, "খাসা-লেজুড়ি"। যারা শেয়ালি-সংস্কৃত জানত তারা সেই ভাষায় ওকে বলত, "সুলোমলাঙ্গুলী"। দুদিন
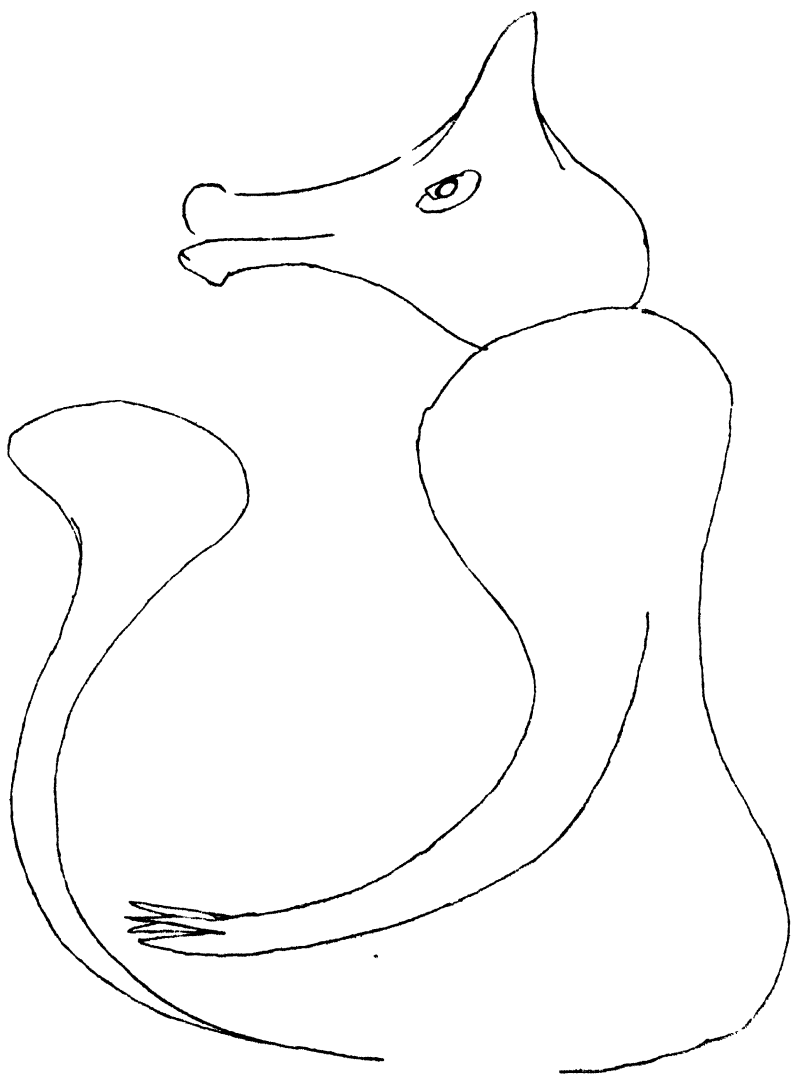
গেল ওর ভাবতে, তিনরাত্রি ওর ঘুম হোলো না। শেষকালে বৃহস্পতিবারে এসে বললে, রাজি।

পাটকিলে রঙের ঝাঁকড়া রোঁয়াওয়ালা ল্যাজটা গেল কাটা, একেবারে গোড়া ঘেঁষে।

সভ্যেরা সকলে বলে উঠল, অহো, পশুর এ কী মুক্তি! ল্যাজবন্ধনের মায়া ওর এতদিনে কেটে গেল! ধন্য!

শিবুরাম একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। চোখের জল সামলিয়ে নিয়ে সেও অতি করুণস্বরে বললে, ধন্য।

সেদিন ওর আহারে রুচি রইল না—সমস্ত রাত সেই কাটা ল্যাজের স্বপ্ন দেখলে।

পরদিন শিবুরাম সভায় এসে হাজির। গোঁসাইজি বললেন, কেমন হে শিবু, দেহটা হালকা বোধ হচ্চে তো?

শিবুরাম বললে, আজ্ঞে, খুবই হালকা। কিন্তু মন বলছে, ল্যাজ গেল তবু মানুষের সঙ্গে বর্ণভেদ তো ঘুচল না।

গোঁসাই বললেন, রং মিলিয়ে সবর্ণ হোতে চাও যদি, তবে রোঁয়া ঘুচিয়ে ফেলো।

তিনু নাপিত এল।

পাঁচদিন লাগ্‌ল খুর বুলিয়ে বুলিয়ে লোমগুলো চেঁচে ফেলতে। রূপ যেটা ফুটে উঠল তা দেখে সভ্যরা সবাই চুপ করে গেল।

শিবুরাম উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, মশায়, আপনারা কোনো কথা বলেন না কেন?

সভ্যরা বললে, আমরা নিজের কীর্ত্তিতে অবাক।

শিবুরাম মনে শান্তি পেল। কাটা ল্যাজ ও চাঁচা রোঁয়ার শোক ভুলে গেল।

সভ্যরা দুই চক্ষু বুজে বল্লেন, শিবুরাম আর নয়। সভা বন্ধ হোলো। এখন—

শিবু বল্লে, এখন আমার কাজ হবে শেয়াল সমাজকে অবাক করা।

এদিকে শিবুরামের পিসি খেঁকিনী কেঁদে কেঁদে মরে। গাঁয়ের মোড়ল হুক্কুইকে গিয়ে বল্লে, মোড়ল মশায়, আজ এক বছরের উপর হয়ে গেল আমার হৌ-হৌকে দেখিনে কেন। বাঘ-ভাল্লুকের হাতে পড়ল না তো?

মোড়ল বল্লে, বাঘ ভাল্লুককে ভয় কিসের? ভয় ঐ মানুষ জানোয়ার-টাকে, হয়তো তাদের ফাঁদে পড়েছে।

খোঁজ পড়ে গেল। ঘুরতে ঘুরতে ভলন্টিয়ারের দল এল সেই চণ্ডীমণ্ডপের বাঁশবনে। ডাক দিলে হুক্কা হুয়া।

শিবুরামের বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠল—একবার গলা ছেড়ে ঐ একতান মন্ত্রে যোগ দিতে ইচ্ছা হোলো। বহুকষ্টে চেপে গেল।

দ্বিতীয় প্রহরে বাঁশবনে আবার ডাক উঠল—হুক্কা হুয়া। এবার শিবু-রামের চাপা গলায় কান্নার মতো একটুখানি রব উঠল। তবু থেমে গেল।

তৃতীয় প্রহরে ওরা আবার যখন ডাক ছাড়লে শিবুরাম আর থাকতে পারলে না, ডেকে উঠল—হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া।

হুক্কুই বল্লে, ঐ তো হৌ-হৌ-এর গলা শুনি। একবার হাঁক দাও তো।

ডাক পড়ল—হৌ-হৌ।

সভাপতি বিছানা ছেড়ে এসে বল্লেন, শিবুরাম!

বাইরে থেকে আবার ডাক পড়ল, হৌ-হৌ! গোঁসাইজি আবার সতর্ক করে দিলেন, শিবুরাম!

তৃতীয়বার ডাকে শিবুরাম ছুটে বেরিয়ে আসতেই শেয়ালরা দিল দৌড়। হুক্কুই, হৈয়ো, হু হু প্রভৃতি বড়ো বড়ো শেয়াল-বীর আপন আপন গর্তের ভিতর গিয়ে ঢুকল।
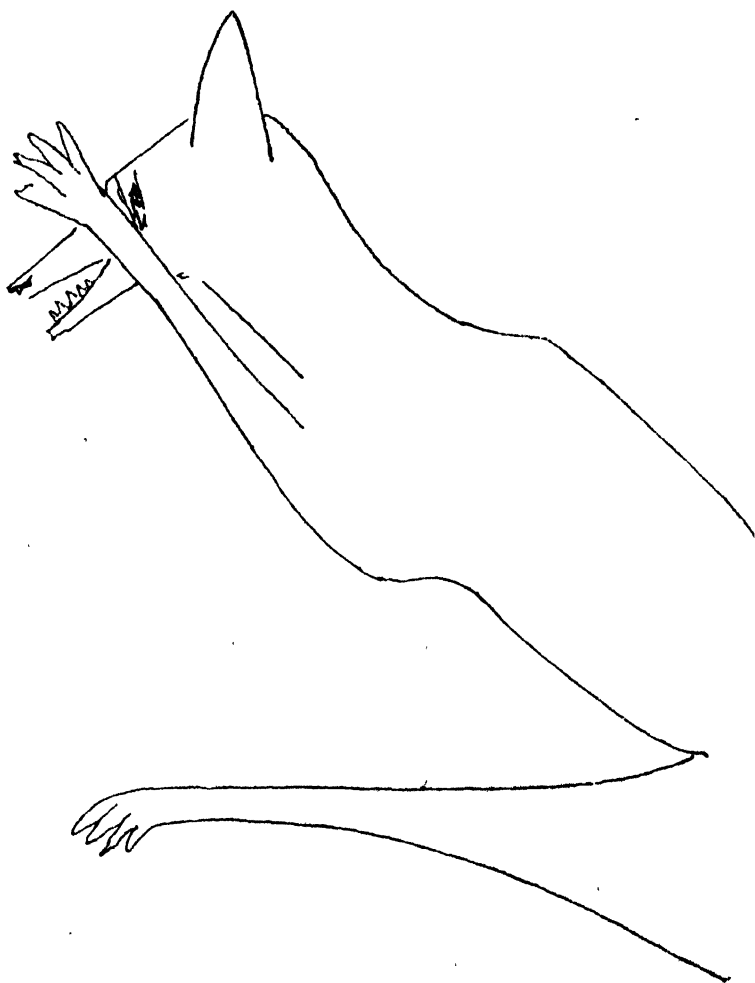
সমস্ত শেয়াল সমাজ স্তম্ভিত।

তারপর ছ মাস গেল।

শেষ খবর পাওয়া গেছে। শিবুরাম সারারাত হেঁকে হেঁকে বেড়াচ্চে, আমার ল্যাজ কই আমার ল্যাজ কই।

গোঁসাইয়ের শোবার ঘরের সামনের রোয়াকে ব'সে উর্দ্ধদিকে মুখ তুলে প্রহরে প্রহরে কোকিয়ে উঠে' বলে, আমার ল্যাজ ফিরে দাও।

গোঁসাই দরজা খুলতে সাহস করে না—ভয় পায় পাছে তাকে ক্ষ্যাপা শেয়ালে কামড়ায়।

শেয়ালকাঁটার বনে যেখানে শিবুরামের বাড়ি সেখানে ওর যাওয়া বন্ধ। জ্ঞাতিরা ওকে দূর থেকে দেখলে, হয় পালায়, নয় খেঁকিয়ে কামড়াতে আসে। ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপেই থাকে, সেখানে একজোড়া প্যাঁচা ছাড়া আর অন্য প্রাণী নেই। খাঁদু, গোবর, বেঁচি, ঢেঁড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো ডানপিটে ছেলেরাও ভূতের ভয়ে সেখানকার জঙ্গল থেকে করমচা পাড়তে যায় না।

শেয়ালি ভাষায় শেয়াল একটা ছড়া লিখেছে, তার আরম্ভটা এই রকম:—

ওরে ল্যাজ, হারা ল্যাজ, চক্ষে দেখি ধুঁয়া।
বক্ষ মোর গেল ফেটে হুক্কা হুয়া হুয়া॥

পুপে ব'লে উঠল, কী অন্যায়, ভারি অন্যায়। আচ্ছা দাদামশায়, ওর মাসিও ওকে নেবে না ঘরে?

আমি বললুম, তুমি ভেবো না; ওর গায়ের রোঁয়াগুলো আবার উঠুক, তখন ওকে চিন্‌তে পার্‌বে।

কিন্তু ওর ল্যাজ?

হয়তো লাঙ্গুলাদ্য ঘৃত পাওয়া যেতে পারে কবিরাজ মশায়ের ঘরে। আমি খোঁজ নেব।

"সে" আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললে, রাগ কোরো না, দাদা, হক্ কথা বলব, তোমারো শোধনের দরকার হয়েছে।

বে-আদব কোথাকার, কিসের শোধন আমার ?

তোমার ঐ বুড়োমির শোধন। বয়স তো কম হয়নি তবু ছেলেমানুষিতে পাকা হোতে পারলে না।

প্রমাণ পেলে কিসে ?

এই যে রিপোর্টটা পড়ে শোনালে, ওটা তো আগাগোড়া ব্যঙ্গ, প্রবীণ বয়সের জ্যাঠামি। দেখলে না পুপুদিদির মুখ, কী রকম গম্ভীর। বোধ হয় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। ভাবছিল, রোঁয়া-চাঁচা শেয়ালটা এখনি এল বুঝি তার কাছে নালিশ করতে। বুদ্ধির মাত্রাটা একটু কমাতে যদি না পারো তাহোলে গল্প-বলা ছেড়ে দাও।

ওটা কমানো আমার পক্ষে শক্ত। তুমি বুঝবে কী ক'রে, তোমাকে তো চেষ্টাই করতে হয় না, বিধাতা আছেন তোমার সহায়।

দাদা, রাগ করছ বটে, কিন্তু আমি ব'লে দিলুম, বুদ্ধির ঝাঁজে তোমার রস যাচ্চে শুকিয়ে। মজা করছ মনে করো কিন্তু তোমার ঠাট্টা গায়ে ঠেকলে ঝামার মতো লাগে। এর আগে তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি— হাসতে গিয়ে হাসাতে গিয়ে পরকাল খুইয়ো না। ল্যাজকাটা শেয়ালের কথা শুনে পুপুদিদির চোখ জলে ভরে এসেছিল দেখতে পাওনি বুঝি। বলো তো আজই তাকে আমি একটুখানি হাসিয়ে দিইগে—বিশুদ্ধ হাসি, তাতে বুদ্ধির ভ্যাজাল নেই।

লেখা তৈরি আছে না কি ?

আছে। নাটকি চালের আলাপ। বললেই হবে, আমাদের পাড়ার উধো গোবরা আর পঞ্চুতে মিলে কথা হচ্চে। ওদের সবাইকে দিদি চেনে।

আচ্ছা, বেশ দেখা যাক্।

গেছো বাবা

উধো। কী রে সন্ধান পেলি ?

গোবরা। আরে ভাই, তোমার কথা শুনে আজ মাসখানেক ধ'রে বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে, হাড় মাটি হোলো, টিকিও দেখতে পেলুম না।

পঞ্চু। কার সন্ধান করছিস্ রে ?

গোবরা। গেছো বাবার।

পঞ্চু। গেছো বাবা ? সে আবার কে রে ?

উধো। জানিস্ নে ? বিশ্বসুদ্ধ লোক তাকে জানে।

পঞ্চু। তা গেছো বাবার ব্যাপারটা কী শুনি ?

উধো। বাবা যে-গাছে চ'ড়ে বসবে সেই গাছই হবে কল্পতরু। তলায় দাঁড়িয়ে হাত পাতলেই যা চাইবি তাই পাবি রে।

পঞ্চু। খবর পেলি কার কাছ থেকে ?

উধো। ধোকড় গাঁয়ের ভেকু সর্দ্দারের কাছ থেকে। বাবা সেদিন ডুমুর গাছে চ'ড়ে ব'সে পা দোলাচ্ছিল, ভেকু জানে না, তলা দিয়ে যাচ্চে, মাথায় ছিল এক হাঁড়ি চিটেগুড়, তামাক তৈরি করবে। বাবার পায়ে ঠেকে তার হাঁড়ি গেল ট'লে,—চিটেগুড়ে তার মুখ চোখ গেল বুজে। বাবার দয়ার শরীর, বললে ভেকু, তোর মনের কামনা কী, খুলে বল্। ভেকুটা বোকা, বললে—বাবা, একখানা ট্যানা দাও মুখটা মুছে ফেলি। যেমনি বলা অমনি গাছ থেকে খসে পড়ল একখানা গামছা। মুখ চোখ মুছে উপরে যখন তাকালো তখন আর কারো দেখা নেই। যা চাইবে কেবল একবার। বাস্, তারপরে কেঁদে আকাশ ফাটালেও সাড়া মিলবে না।

পঞ্চু। হায়রে হায়, শাল নয় দোশালা নয় শুধু একখানা গামছা! ভেকুর আর বুদ্ধি কত হবে।

—পৃঃ ২৬

উধো। তা হোক্ নেপু। ঐ গামছা নিয়েই তার দিব্যি চলে যাচ্চে— দেখিস্‌নি রথতলার কাছে অত বড়ো আটচালা বানিয়েছে। গামছা হোক, বাবার গামছা তো।

পঞ্চু। কী ক'রে হোলো? ভেল্‌কি নাকি?

উধো। হোঁদলপাড়ার মেলায় ভেকু সেদিন বাবার গামছা পেতে বসল। হাজারে হাজারে লোক এসে জুটল। বাবার নামে টাকাটা শিকেটা আলুটা মুলোটা চারদিক থেকে গামছার উপর পড়তে লাগল। মেয়েরা কেউ বা এসে বলে, ও ভেকুদাদা, আমার ছেলেটার মাথায় বাবার গামছা একটু ঠেকিয়ে দে, আজ তিনমাস ধ'রে জ্বরে ভুগছে। ওর নিয়ম হচ্চে নৈবিদ্যি চাই পাঁচশিকে, পাঁচটা সুপুরি, পাঁচ কুন্‌কে চাল, পাঁচ ছটাক ঘি।

পঞ্চু। নৈবিদ্যি তো দিচ্চে, ফল পাচ্চে কিছু?

উধো। পাচ্চে বৈ কি? গাজন পাল গামছা ভ'রে পনেরো দিন ধ'রে ধান ঢেলেছে, তার পরে ঐ গামছার কোণে দড়ি লাগিয়ে একটা পাঁঠাও দিলে বেঁধে, ঐ পাঁঠার ডাকে চারদিক থেকে লোক এসে জমল। কী বলব ভাই, মাস এগারো পরেই গাজনের চাকরি জুটে গেল। আমাদের রাজবাড়ির কোতোয়ালের সিদ্ধি ঘোঁটে, তার দাড়ি চুমরিয়ে দেয়।

পঞ্চু। সত্যি বলছিস্?

উধো। সত্যি না তো কী? গাজন যে আমার মামাতো ভাইয়ের ভায়রা ভাই হয়।

পঞ্চু। আচ্ছা ভাই উধো, গামছাটা তুই দেখেছিস?

উধো। দেখেছি বৈ কি। হটুগঞ্জের তাঁতে দেড়গজ ওসাড়ের যে গামছা বুনুনি হয়, চাঁপার বরণ জমি, লাল পাড়, এক্কেবারে বেমালুম তাই!

পঞ্চু। বলিস্ কী? তা সে গাছের উপর থেকে পড়ল কী ক'রে?

উধো। ঐ তো মজা। বাবার দয়া!

পঞ্চু। চল্ ভাই চল্, খোঁজ করতে বেরই। কিন্তু চিনব কী ক'রে ?

উধো। সেই তো মুস্কিল। কেউ তো তাকে দেখেনি। আবার ছবি তো হ', ভেকু বেটার চোখ গেল চিটেগুড়ে বুজে'।

পঞ্চু। তবে উপায় ?

উধো। আমি তো হাটে ঘাটে যাকে দেখছি তাকেই জোড়হাত ক'রে জিগেস করছি, দয়া ক'রে জানাও, তুমিই কি গেছো বাবা ? শুনে তারা তেড়ে মারতে আসে। একজন তো দিল আমার মাথায় হুঁকোর জল ঢেলে।

গোবরা। তা দিক্ গে। ছাড়া হবে না। খুঁজে বের করবই। যা থাকে কপালে।

~~পঞ্চু।~~ ভেকু বলে, গাছে চড়লেই তবে বাবার চেহারা ধরা পড়ে, যখন নিচে থাকেন চেনবারই জো নেই।

উধো। গাছে চড়িয়ে চড়িয়ে মানুষকে পরখ করব কী ক'রে ভাই ? আমি এক বুদ্ধি করেছি,আমার আমড়া গাছ আমড়ায় ভরে গেছে, যাকে দেখছি তাকেই বলছি, আমড়া পেড়ে নাও—গাছটা প্রায় খালি হয়ে এল, ডালগুলোও ভেঙেছে।

পঞ্চু। আর দেরি নয়রে চল্। কপালের জোর যদি থাকে তবে দর্শন লাভ হবেই। একবার গলা ছেড়ে ডাক দে না ভাই! গেছো বাবা, ও বাবা, দয়াল বাবা, পারুল বনে কোথাও যদি থাকো লুকিয়ে একবার অভাগাদের দর্শন দাও।

গোবরা। ওরে হয়েছে রে, দয়া হোলো বুঝি !

পঞ্চু। কই রে কই।

গোবরা। ঐ যে চালতা গাছে।

পঞ্চু। কী রে চালতা গাছে কী, দেখছিনে তো কিছু !

গোবরা। ঐ যে দুলছে !

পঞ্চু। কী দুলছে। ও তো ল্যাজ রে!

উধো। তোর কেমন বুদ্ধি গোবরা, ও বাবার ল্যাজ নয়রে, হনুমানের ল্যাজ। দেখছিস্‌নে মুখ ভ্যাঙাচ্চে।

গোবরা। ঘোর কলি যে! বাবা ঐ কপিরূপ ধরেছেন—আমাদের ভোলাবার জন্যে।

পঞ্চু। ভুলছিনে বাবা, কালামুখ দেখিয়ে ভোলাতে পারবে না। যত পারো মুখ ভ্যাঙাও, নড়ছিনে—তোমার ঐ শ্রীল্যাজের শরণ নিলুম।

গোবরা। ওরে, বাবা যে লম্বা লাফ দিয়ে পালাতে সুরু করল রে।

পঞ্চু। পালাবে কোথায়? আমাদের ভক্তির দৌড়ের সঙ্গে পারবে কেন?

গোবরা। ঐ বসেছে কয়েৎবেল গাছের ডগায়।

উধো। পঞ্চু, উঠে পড়্‌ না গাছে!

পঞ্চু। আরে তুই ওঠ্‌ না!

উধো। আরে তুই ওঠ্‌।

পঞ্চু। অত উচ্চে উঠ্‌তে পারব না বাবা, কৃপা ক'রে নেমে এসো।

উধো। বাবা, তোমার ঐ শ্রীল্যাজ গলায় বেঁধে অন্তিমে যেন চক্ষু মুদতে পারি এই আশীর্ব্বাদ করো।

(প্রস্থান)

* * * * *

ওহে কমবুদ্ধি, হাসাতে পারলে?

না। যে-মানুষ সবই বিনাবিচারে বিশ্বাস করতে পারে তাকে হাসানো সোজা নয়।

ভয় হচ্চে পুপেদিদি পাছে গেছোবাবার সন্ধান করতে আমাকে পাঠায়। মুখ দেখে আমারও তাই বোধ হচ্চে। গেছোবাবার পরে ওর টান পড়েছে।

আচ্ছা কাল পরীক্ষা ক'রে দেখব বিশ্বাস না করিয়েও মজা লাগাতে পারা যায় কিনা।

কিছুক্ষণ বাদে পুপু এসে বললে, আচ্ছা দাদামশায়, গেছোবাবার কাছে তুমি হোলে কী চাইতে।

আমি বললেম, পুপুদিদির জন্যে এমন একটা কলম চাইতেম যা নিয়ে লিখতে বসলে অঙ্ক কষতে একটা ভুলও হোত না।

পুপুদিদি হাততালি দিয়ে বলে উঠ্‌ল, আঃ সে কী মজাই হোত!

অঙ্কে দিদি এবার একশোর মধ্যে সাড়ে তেরো মার্কা পেয়েছে।

৪

স্বপ্ন দেখছি কি জেগে আছি বলতে পারিনে। জানিনে কত রাত। ঘর অন্ধকার, লণ্ঠনটা আছে বারান্দায়, দরজার বাইরে। একটা চামচিকে পোকার লোভে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্চে, গয়ায় পিণ্ডি-না-দেওয়া ভূতের মতো।

সে এসে হাঁক দিলে,—দাদা ঘুমচ্চ না কি।—ব'লেই ঘরে ঢুকে পড়ল। কালো কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ মোড়া।

জিগেস করলেম, এ কেমন সজ্জা তোমাব।

বললে, আমার বরসজ্জা।

বরসজ্জা! বুঝিয়ে বলো।

কনে দেখতে যাচ্চি।

জানিনে কেন আমার যেন ঘুমে-ঘোলা বুদ্ধিতে ঠেকল যে, ঠিক হয়েছে, এই সজ্জাই উচিত। উৎসাহ দিয়ে বললুম, সেজেছ ভালো। তোমার ওরিজিন্যালিটি দেখে খুসি হলুম। একেবারে ক্লাসিকাল সাজ।

কী রকম।

ভূতনাথ যখন তাঁর তপস্বিনী কনেকে বর দিতে এলেন, তাঁর গায়ে ছিল হাতির চামড়া। তোমার এটা যেন ভালুকের চামড়া। নারদ দেখলে খুসি হতেন।

দাদা সমজদার তুমি। এলেম এই জন্যেই তোমার কাছে এত রাত্তিরে।

কত রাত বলো দেখি।

দেড়টার বেশি হবে না।

কনে কি এখনি দেখা চাই।

হাঁ এখনি।

শুনেই বলে উঠলেম,—ভারি চমৎকার।

কী কারণে বলো তো।

কেন যে এতদিন এই আইডিয়াটা মাথায় আসেনি তাই ভাবি। আপিসের বড়োসাহেবের মুখ-দেখা দিনের রোদ্দুরে, আর কনে দেখা মাঝরাত্তিরের অন্ধকারে।

দাদা, তোমার মুখের কথা যেন অমৃত সমান। একটা পৌরাণিক নজির দাও তো।

মহাদেব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন মহাকালীর দিকে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে, এই কথাটা স্মরণ কোরো।

অহো, দাদা তোমার কথায় আমার গায়ে কাঁটা দিচ্চে। সাব্লাইম যাকে বলে। তাহোলে আর কথা নেই।

কনেটি কে এবং আছেন কোথায়।

আমার বৌদিদির ছোটো বোন, আছেন তাঁরি বাড়িতে।

চেহারায় তোমার বৌদিদির সঙ্গে কি মেলে।

মেলে বই কি। সহোদরা বটে।

তাহোলে অন্ধকার রাতের দরকার আছে।

বৌদি স্বয়ং ব'লে দিয়েছেন—টর্চটা যেন সঙ্গে না আনি।

বৌদির ঠিকানাটা!

সাতাশ মাইল দূরে—চৌচাকলা গ্রামে, উনকুণ্ড পাড়ায়।

ভোজন আছে তো।

আছে বৈকি।

শুনে কোন্ মোহের ঘোরে যে মনটা পুলকিত হোলো বল্‌তে পারিনে।

লিভরের দোষে ভুগে আসছি বারোবছর—খাবার নাম শুনলেই পিত্তি যায় বিগড়ে।

জিগেস করলেম, খাওয়াটা কী রকম হবে শুনি।

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, অতি উত্তম, অতি উত্তম, অতি উত্তম। বৌদি আমসত্ত দিয়ে উচ্ছেসিদ্ধ চমৎকার রাঁধে, আর কুলের আঁটি ঢেঁকিতে কুটে তার সঙ্গে দোক্তার জল মিশিয়ে চাট্‌নি--

ব'লেই নাচ জুড়ে দিল বিলিতি চালে, টিটিটম্‌টম্‌, টিটিটম্‌টম্‌, টিটিটম্‌টম্‌।

জীবনে কোনোদিন নাচিনি—হঠাৎ নাচ পেয়ে গেল, দুজনে হাত ধরা-ধরি ক'রে নাচতে সুরু ক'রে দিলুম, টিটিটম্‌টম্‌। মনে হোলো আশ্চর্য্য আমার ক্ষমতা, যমুনা দিদি যদি দেখ্‌ত তবে বল্‌ত নাচ বটে।

শেষকালে হাঁপিয়ে উঠে ধপ্‌ ক'রে বসে পড়লুম। বললুম, আহারের ফর্দ্দ যা দিলে একেবারে খাঁটি ভিটামিন। লিভরের পক্ষে অমৃত। কনে দেখতে যাবে তো কনের পরীক্ষা তো চাই।

একদফা হয়ে গেছে আগেই।

কী রকম ?

মনে করলুম মিলন হবার আগে মিলের পরীক্ষা চাই। ঠিক কিনা বলো।

ঠিক তো বটেই। পরীক্ষার প্রণালীটা কী।

জিগেস করা চাই শোলোক মেলাতে পারো কি না। দূত পাঠিয়েছিলুম 'রংমশাল'-এর সহ-সম্পাদককে, তিনি আওড়ালেন—

সুন্দরী, তুমি কালো কুষ্টি,—

বললেন, মিল ক'রে এর জবাব দিতে হবে, পুরো মাপের মিল।

কনেটি এক নিঃশেষে ব'লে দিলে—

কানা তুমি, নেই ভালো দৃষ্টি।

সহ-সম্পাদকের এটা অসহ হোলো, ব'লে দিলে—

ব্রহ্মা লম্বা হাতে
তোমাকে গড়েছে রাতে
যবে শেষ হোলো আলোবৃষ্টি।

লম্বা হাতে বলবার তাৎপর্য্য কী হোলো ?

মেয়েটি ঢ্যাঙা আছে শুনেছি,—তোমার চেয়ে ইঞ্চি দুই তিন বড়ো হবে। তাই শুনেই তো আমার উৎসাহ।

বলো কী ?

একখানা মেয়ে বিয়ে করতে গিয়ে পাওয়া যাবে আধখানা ফাউ।

এ কথাটা আমার মাথায় ওঠেনি।

যা হোক দাদা, সহ-সম্পাদকের কাছে হার মেনে ও হার-মানার একটা কবুলতি দিয়ে দিয়েছে।

কী রকম !

মাছের আঁশের হার গেঁথে ওর গলায় পরিয়েছে, বলেছে যশঃসৌরভ তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে।

আমি লাফ দিয়ে ব'লে উঠলুম—ধন্য ! এবার দেখছি এক অসাধারণের সঙ্গে আর-এক অসাধারণের মিলন হবে, জগতে এমন কদাচিৎ ঘটে। তাহোলে আর কেন দিনক্ষণ দেখা।

কিন্তু মেয়েটির পণ, ওকে যে হারাতে পারবে তাকেই ও বিয়ে করবে।

রূপে ?

না, কথার মিলে। ঠিকমতো যদি মেলাতে পারি তাহোলে ও নিজেকে দেবে জলাঞ্জলি।

পারবে তো।

নিশ্চয়।

প্ল্যানটা কী শুনি।

বলব, চার লাইনে আমার চরিত্র বর্ণনা করো, স্তবে আমাকে খুসি ক'রে দাও। মিল হওয়া চাই ফর্ষ্ট্ ক্লাস।

কনে দেখার যদি পেটেণ্ট নেওয়া চল্‌ত তুমি নিতে পারতে। বরের স্তব দিয়ে সুরু। অতি উত্তম। উমা তাতেই জিতেছিলেন।

প্রথম লাইনটা ওকে ধরিয়ে দিতে হবে, নইলে আমার চরিত্রের থই পাবে না—আমার বর্ণনার ধুয়োটি হচ্চে এই :—

তুমি দেখি মানুষটা একেবারে অদ্ভুত।

পুরো বছরের মিল দাবি করলে মেয়েটি বোধ হয় মাথায় হাত দিয়ে পড়বে। ওকে হার মানতেই হবে। আচ্ছা দাদা, তুমিই দাও দেখি ওর পরের লাইনটা যোগ ক'রে।—

আমি বললেম,—

স্কন্ধে তোমার বুঝি চাপিয়াছে বদ্‌ভূত।

এক্‌সেলেণ্ট্। কিন্তু আর দুটো লাইন না হোলে শ্লোক তো ভর্ত্তি হয় না। আমি বল্‌ছি, কনে তো কনে, কনের বাবার সাধ্যি হবে না ওর মিল বের করতে। দাদা তোমার মাথায় কিছু আসছে? ভাষায় হোক্ অভাষায় হোক্।

একেবারেই না।

তাহোলে শোনো—

ছাত থেকে লাফ দাও, পাক দেখে ঝাঁপ দাও
যখন তখন করো যদ্ভূত তদ্ভূত।

ও আবার কী! ওটা কোন্ দিশি বুলি।

দেবভাষা সংস্কৃত—কিম্ভূত শব্দের এক পর্য্যায়।

যদ্ভূত তদ্ভূত মানেটা কী হোলো?

ওর মানে, যা খুসি তাই। ওটা বঙ্গভাষায়--যাকে হাল আমলের পণ্ডিতেরা বলেছে, "অবদান।"

লোকটার 'পরে আমার ভক্তি কূল ছাপিয়ে উঠল। মনে হোলো অসাধারণ প্রতিভা। ওর পিঠ থাবড়িয়ে বললুম, স্তম্ভিত করেছ আমাকে।

সে বললে, স্তম্ভিত হোলে চলবে কেন? চলতে হবে। লগ্ন বয়ে যাচ্চে। ফস্ ক'রে ববকরণ পেরিয়ে যাবে কখন্, এসে পড়বে তৈতিলকরণ, বৈষ্কুম্ভ যোগ, তার পরেই হর্ষণ যোগ, বিষ্টিকরণ, শেষ রাত্তিরে অস্থক যোগ, ধনিষ্ঠানক্ষত্র—গোস্বামীমতে ব্যতীপাতযোগ বালবকরণ, পরিঘযোগে যখন গরকরণ এসে পড়বে তখন বিপদ হবে—ঘরকরণার পক্ষে গরকরণের মতো এত বড়ো বাধা আর নেই। সিদ্ধিযোগ ব্রহ্মযোগ ইন্দ্রযোগ শিবযোগ এই হপ্তার মধ্যে একদিনো পাওয়া যাবে না, বরীয়ান যোগের অল্প একটু আশা আছে যখন পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের দৃষ্টি পড়বে।

কাজ নেই, কাজ নেই এখখনি বেরিয়ে পড়া যাক্। ডাক দাও পুত্তু-লালকে মোটরখানা আনুক। সে এতক্ষণে চরকা কাটতে বসেছে। চরকা কাটতে কাটতে তবে সে ঘুমতে পারে, মোটর চালিয়ে চালিয়ে তার এই দশা হয়েছে।

গাড়িতে চড়ে বসলুম।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছি, ঘোর অন্ধকার। পুকুরের ধারে আসসেওড়ার ঝোপ। হঠাৎ তার ভিতর থেকে খেঁকশিয়ালী উঠল ডেকে। তখন রাত সাড়ে তিনটে হবে। যেমনি ডাকা, পুত্তুলাল চমকে উঠে গাড়িসুদ্ধ গিয়ে পড়ল একগলা জলের মধ্যে। এদিকে তার পিঠের কাপড়ের ভিতরে একটা ব্যাঙ ঢুকে লাফালাফি করছে। আর পুত্তুলালের সে কী চেঁচানি! আমি

—পৃঃ ৩৪

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, পুত্তুলাল, তোর পিঠে বাত আছে, ব্যাঙটাকে খুব কষে লাফাতে দে, বিনিপয়সায় অমন ভালো মালিষ আর পাবিনে। গাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ডাক দিতে লাগলুম, বনমালী, বনমালী। ইষ্টুপিডের কোনো সাড়াশব্দ নেই। স্পষ্টই বোঝা গেল সে তখন বোলপুর ষ্টেশনের প্ল্যাট্‌ফরমে চাদরমুড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্চে। ভারি রাগ হোলো। ইচ্ছে করল তার নাকের মধ্যে ফাউন্টেন পেনের সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে হাঁচিয়ে দিয়ে আসিগে। এদিকে পাঁকের জলে আমার চুলগুলো গেছে ভিজে। না আঁচড়ে নিয়ে ওর বৌদিদির ওখানে যাই কী ক'রে। গোলমাল শুনে পুকুরপাড়ে হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক ক'রে ডেকে উঠেছে। একলাফ দিয়ে পড়লুম তাদের মধ্যে; একটাকে চেপে ধরে তার ডানা দিয়ে ঘষে ঘষে চুলটা একরকম ঠিক ক'রে নিলুম। পুত্তুলাল বললে, ঠিক বলেছ দাদাবাবু। ব্যাঙের লাফে বড়ো আরাম বোধ হচ্চে। ঘুম আসছে।

যাওয়া গেল ওর বৌদিদির বাড়িতে। ক্ষিদের চোটে একেবারে ভুলে গেছি কনে দেখার কথা। বৌদিদিকে জিগেস করলেম, আমার সঙ্গে ছিল সে, তাকে দেখছিনে কেন?

তিন হাত দোপাট্টা কাপড়ের ঘোমটার ভিতর থেকে মিহিস্সুরে বৌদিদি বললে, সে কনে খুঁজতে গেছে।

কোন্ চুলোয়?

মজা দিঘির ধারে বাঁশতলায়।

কত দূর হবে?

তিন পহরের পথ।

দূর বেশি নয় বটে। কিন্তু ক্ষিধে পেয়েছে। তোমার সেই চাটনি বের করো দিকি।

বৌদিদি নাকিস্সুরে বল্‌লে, হায়রে, আমার পোড়াকপাল, এই গেল

মঙ্গলবারের আগের মঙ্গলবারে ফাটা ফুটবল্ ভর্তি ক'রে সমস্তটা পাঠিয়ে দিয়েছি বুজুদিদির ওখানে—সে ওটা খেতে ভালোবাসে ছোলার ছাতুর সঙ্গে শর্ষে তেল আর লঙ্কা দিয়ে মেখে।

মুখ শুকিয়ে গেল, বললুম, আমরা খাই কী।

বৌদিদি বললে, শুক্‌নো কুচো চিংড়িমাছের মোরব্বা আছে টাট্‌কা চিটেগুড়ে জমানো। বাছারা খেয়ে নাও, নইলে পিত্তি পড়ে যাবে।

কিছু খেলেম, অনেকটাই রইল বাকি। পুত্তুলালকে জিগেস করলুম, খাবি? সে বললে ভাঁড়টা দাও, বাড়ি গিয়ে আহ্নিক ক'রে খাব। বাড়ি এলেম ফিরে। চটিজুতো ভিজে, গা-ময় কাদা।

বনমালীকে ডাক দিয়ে বললুম, বাঁদর, কী করছিলি।

সে হাউহাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বললে, বিছে কামড়েছিল, তাই ঘুমচ্ছিলুম।—ব'লেই সে চলে গেল ঘুমতে।

এমন সময় একটা গুণ্ডাগোছের মানুষ একেবারে ঘরের মধ্যে উপস্থিত। মস্ত লম্বা, ঘাড় মোটা, মোটা পিপের মতো গর্দ্দান, বনমালীর মতো রং কালো, ঝাঁকড়া চুল, খোঁচা খোঁচা গোঁফ, চোখ দুটো রাঙা, গায়ে ছিটের মেরজাই, কোমরে লালরঙের ডোরাকাটা লুঙির উপর হল্‌দে রঙের তিন-কোণা গামছা বাঁধা, হাতে পিতলের কাঁটামারা লম্বা একটা বাঁশের লাঠি, গলার আওয়াজ যেন গদাইবাবুদের মোটর গাড়িটার শিঙের মতো। হঠাৎ সে সাড়ে তিন মোণ ওজনের গলায় ডেকে উঠল—"বাবুমশায়।"

চমকে উঠে কলমের খোঁচায় খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে গেল।

বললুম, কী হয়েছে, কে তুমি।

সে বললে, আমার নাম পাল্লারাম, দিদির বাড়ি থেকে এসেছি, জানতে চাই তোমাদের 'সে' কোথায় গেল।

আমি বললুম—আমি কী জানি।

পাল্লারাম চোখ পাকিয়ে হাঁক দিয়ে বললে, জানো না বটে! ঐ যে তার তালি-দেওয়া আঁশ-বের-করা সবুজ রঙের একপাটি পশমের মোজা কাদাসুদ্ধ শুকিয়ে গিয়ে মরা কাঠবেড়ালীর কাটা লেজের মতো তোমার বইয়ের শেলফে ঝুলছে ওটা ফেলে সে যাবে কোন্ প্রাণে।

আমি বললুম, লোকসান সইবে না, যেখানে থাকে ফিরে আসবেই। কিন্তু হয়েছে কী।

পাল্লারাম বল্‌লে, পর্শুদিন সন্ধ্যের সময় দিদি গিয়েছিল জঙ্গিলাটের বাড়ি।—লাটগিন্নির সঙ্গে গঙ্গাজল পাতিয়েছে।—ফিরে এসে দেখে, একটা ঘটি একটা ছাতা, একজোড়া তাস, হারিকেন লণ্ঠন, আর একটা পাথুরে কয়লার ছালা নিয়ে কোথায় "সে" চ'লে গেছে; দিদি বাগান থেকে একঝুড়ি বাঁশের কোঁড়া, লাউডগা আর বেতোশাক তুলে রেখেছিল তাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দিদি ভারি রাগ করছে।

আমি বললুম—তা আমি কী করব!

পাল্লারাম বললে, তোমার এখানে কোথায় সে লুকিয়ে আছে, তাকে বের ক'রে দাও।

আমি বললুম, এখানে নেই, তুমি থানায় খবর দাও গে।

নিশ্চয় আছে।

আমি বললুম, ভালো মুস্কিলে ফেললে দেখছি—বলছি সে নেই।

নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় আছে।—বলতে বলতে পাল্লারাম আমার টেবিলের উপর দমাদ্দম তার বাঁশের লাঠির মুণ্ডটা ঠুকতে লাগল। পাশের বাড়িতে একটা পাগল ছিল সে শেয়াল ডাকের নকল ক'রে হাঁক দিল হুক্কাহুয়া। পাড়ার সব কুকুর চেঁচিয়ে উঠল। বনমালী আমার জন্যে একগ্লাস বেলের সরবৎ রেখে গিয়েছিল সেটা উল্‌টিয়ে বোতল ভেঙে বেগ্‌নি রঙের কালীর সঙ্গে মিশে রেশমের চাদর বেয়ে আমার জুতোর মধ্যে গিয়ে

জমল। চীৎকার করতে লাগলুম, বনমালী, বনমালী। বনমালী ঘরে ঢুকেই পাল্লারামের চেহারা দেখে বাপ-রে মা-রে ব'লে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড় দিলে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বললেম, 'সে' গেছে কনের খোঁজ করতে।

কোথায়।

মজাদিঘির ধারে বাঁশতলায়। লোকটা বললে,—সেখানে যে আমারি বাড়ি।

তাহোলে ঠিক হয়েছে। তোমার মেয়ে আছে ?

আছে।

এইবার তোমার মেয়ের পাত্র জুটল।

জুটল এখনো বলা যায় না। এই ডাণ্ডা নিয়ে ঘাড়ে ধরে তার বিয়ে দেব, তারপরে বুঝব কন্যাদায় ঘুচল।

তাহোলে আর দেরি কোরো না। কনে দেখার পরেই বরকে দেখা হয়তো সহজ হবে না।

সে বল্‌লে, ঠিক কথা।

একটা ভাঙা বালতি ছিল ঘরের বাইরে। সেটা ফস্ ক'রে তুলে নিলে। জিগেস করলেম, ওটা নিয়ে কী হবে ?

ও বললে, বড়ো রোদ্দুর, টুপির মতো ক'রে পরব।

ও তো গেল। তখন কাক ডাকছে, ট্র্যামের শব্দ সুরু হয়েছে। বিছানা থেকে ধড়ফড় ক'রে উঠেই ডাক দিলেম বনমালীকে। জিগেস করলেম, ঘরে কে ঢুকেছিল।

ও চোখ রগড়ে বললে, দিদিমণির বেড়ালটা।

এই পর্য্যন্ত শুনে পুপেদিদি হতাশভাবে বললে, ও কী কথা দাদামশায়, তুমি যে বলছিলে, তুমি নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলে, তারপরে তোমার ঘরে এসেছিল পাল্লারাম।

—পৃঃ ৪১

সামলে নিলুম। আর একটু হোলেই বুদ্ধিমানের মতো বলতে যাচ্ছিলুম, আগাগোড়া স্বপ্ন। সব মাটি হোত। এখন থেকে পাল্লারামকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগতে হবে যেমন ক'রে পারি। স্বপ্ন যখন বিধাতা ভাঙেন নালিশ খাটে না। আমরা ভাঙলে বড়ো নিষ্ঠুর হয়।

পুপুদিদি বল্‌লে, দাদামশায়, ওদের দুজনের বিয়ে হোলো কি না বললে না তো কিছু।

বুঝলুম বিয়ে হওয়াটা জরুর দরকার। বল্‌লুম, বিয়ে না হয়ে কি রক্ষা আছে।

তারপরে তোমার সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে কি।

হয়েছে বৈ কি। তখন ভোর সাড়ে চারটে, রাস্তার গ্যাস নেবেনি। দেখলুম, নতুন বৌ তার বরকে ধরে নিয়ে চলেছে।

কোথায়।

নতুন বাজারে মানকচু কিন্‌তে।

মানকচু!

হাঁ, বর আপত্তি করেছিল।

কেন।

বলেছিল, অত্যন্ত দরকার হোলে বরঞ্চ কাঁঠাল কিনে আনতে পারি, মানকচু পারব না।

তারপরে কী হোলো।

আনতে হোলো মানকচু কাঁধে করে।

খুসি হোলো পুপু, বল্‌লে, খুব জব্দ!

৫

সকালে বসে চা খাচ্চি এমন সময় সে এসে উপস্থিত।

জিগেস করলুম, কিছু বলবার আছে।

ও বললে, আছে।

চট্‌ ক'রে বলে ফেলো, আমাকে এখনি বেরতে হবে।

কোথায়।

লাটসাহেবের বাড়ি।

লাটসাহেব তোমাকে ডাকেন না কি।

না, ডাকেন না, ডাকলে ভালো করতেন।

ভালো কিসের।

জানতে পারতেন, ওঁরা যাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে থাকেন আমি তাদের চেয়েও খবর বানাতে ওস্তাদ। কোনো রায় বাহাদুর আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, সে কথা তুমি জানো।

জানি কিন্তু আমাকে নিয়ে আজকাল তুমি যা-তা বলছ।

অসম্ভব গল্পেরই যে ফরমাস।

হোক না অসম্ভব তারো তো একটা বাঁধুনি থাকা চাই। এলোমেলো অসম্ভব তো যে-সে বানাতে পারে।

তোমার অসম্ভবের একটা নমুনা দাও।

আচ্ছা বলি শোনো ঃ—

—পৃঃ ৪৪

স্মৃতিরত্নমশায় মোহনবাগানের গোল-কীপারি ক'রে ক্যালকাটার কাছ থেকে একে একে পাঁচ গোল খেলেন। খেয়ে ক্ষিদে গেল না, উল্টো হোলো, পেট চোঁ চোঁ করতে লাগল। সামনে পেলেন অক্‌টর্লনি মন্যুমেণ্ট। নিচে থেকে চাটতে চাটতে চূড়ো পর্য্যন্ত দিলেন চেটে।

বদরুদ্দিন মিঞা সেনেটহলে বসে জুতো সেলাই করছিল, সে হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এল। বললে—আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এত বড়ো জিনিষটাকে এঁটো করে দিলেন।" 'তোবা তোবা' ব'লে তিনবার মন্যুমেণ্টের গায়ে থুথু ফেলে মিঞাসাহেব দৌড়ে গেল ষ্টেট্‌সম্যান্ আপিসে খবর দিতে।

স্মৃতিরত্নমশায়ের হঠাৎ চৈতন্য হোলো মুখটা তাঁর অশুদ্ধ হয়েছে। গেলেন ম্যুজিয়মের দরোয়ানের কাছে। বললেন, পাঁড়েজি, তুমিও ব্রাহ্মণ আমিও ব্রাহ্মণ, একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

পাঁড়েজি দাড়ি চুমরিয়ে নিয়ে সেলাম ক'রে বললে, কোমা ভূ পোর্তে ভূ সি ভূ প্লে।

পণ্ডিতমশায় একটু চিন্তা ক'রে বললেন, বড়ো শক্ত প্রশ্ন, সাংখ্যকারিকা মিলিয়ে দেখে কাল জবাব দিয়ে যাব। বিশেষ আজ আমার মুখ অশুদ্ধ, আমি মন্যুমেণ্ট চেটেছি।

পাঁড়েজি দেশালাই দিয়ে বর্ম্মা চুরুট ধরাল। দুটান টেনে বললে, তাহোলে এক্ষুনি খুলুন ওয়েবষ্টার ডিক্‌সনারী, দেখুন বিধান কী।

স্মৃতিরত্ন বললেন, তাহোলে তো ভাটপাড়ায় যেতে হয়। সে পরে হবে, আপাতত তোমার ঐ পিতলে বাঁধানো ডাণ্ডাখানা চাই।

পাঁড়ে বললে, কেন কী করবেন, চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়েছে বুঝি?

স্মৃতিরত্ন বললেন, তুমি খবর পেলে কেমন ক'রে? সে তো পড়েছিল পর্শু দিন। ছুটতে হোলো উল্টোডিঙিতে যকৃত-বিকৃতির বড়ো ডাক্তার ম্যাকার্টনি

— পৃঃ ৪৪

সাহেবের কাছে। তিনি নারকেলডাঙা থেকে সাবল আনিয়ে সাফ করে দিলেন।

পাঁড়েজি বললে, তবে ডাণ্ডায় তোমার কী প্রয়োজন।

পণ্ডিতমশায় বললেন, দাঁতন করতে হবে।

পাঁড়েজি বললে, ওঃ তাই বলো, আমি বলি নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচবে বুঝি, তাহোলে আবার গঙ্গাজল দিয়ে শোধন করতে হোত।

এই পর্য্যন্ত ব'লে গুড়গুড়িটা কাছে নিয়ে দুটান টেনে "সে" বললে, দেখো দাদা, এই রকম তোমার বানিয়ে বলবার ধরণ। এ যেন আঙুল দিয়ে না লিখে গণেশের শুঁড় দিয়ে লম্বা চালে বাড়িয়ে লেখা। যেটাকে এরকম জানি সেটাকে অন্যরকম করে দেওয়া। অত্যন্ত সহজ কাজ, যদি বলো লাট-সাহেব কলুর ব্যবসা ধ'রে বাগবাজারে শুটকি মাছের দোকান খুলেছেন তবে এমন শস্তা ঠাট্টায় যারা হাসে তাদের হাসির দাম কিসের।

চটেছ ব'লে বোধ হচ্চে।

কারণ আছে। আমাকে নিয়ে পুপুদিদিকে সেদিন যাচ্ছে-তাই কতকগুলো বাজে কথা বলেছিলে। নিতান্ত ছেলেমানুষ ব'লেই দিদি হাঁ ক'রে সব শুনেছিল। কিন্তু অদ্ভুত কথা যদি বলতেই হয় তবে তারমধ্যে কারিগরি চাই তো।

সেটা ছিল না বুঝি?

না ছিল না। চুপ করে থাকতুম যদি আমাকে সুদ্ধ না জড়াতে। যদি বলতে, তোমার অতিথিকে তুমি জিরাফের মুড়িঘণ্ট খাইয়েছ, শর্ষে-বাঁটা দিয়ে তিমিমাছ ভাজা আর পোলাওয়ের সঙ্গে পাঁকের থেকে টাট্‌কা ধরে-আনা জলহস্তী। আর তার সঙ্গে তালের গুঁড়ির ডাঁটা-চচ্চড়ি, তাহোলে আমি বলতুম ওটা হোলো স্থূল। ও রকম লেখা সহজ।

আচ্ছা, তুমি হোলে কী রকম লিখতে।

—পৃঃ ৪৮

বলি, রাগ করবে না! দাদা, তোমার চেয়ে আমার কেরামতি যে বেশি তা নয়। কম ব'লেই সুবিধে। আমি হোলে বলতুম, তাসমানিয়াতে তাস-খেলার নেমতন্ন ছিল, যাকে বলে, দেখা-বিন্তি। সেখানে কোজুমাচুকূ ছিলেন বাড়ির কর্ত্তা, আর গিন্নির নাম ছিল, শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুস্কুনা। তাঁদের বড়ো মেয়ের নাম পামকুনি দেবি, স্বহস্তে রেঁধেছিলেন কিন্টিনাবুর মেরিউনাথু, তার গন্ধ যায় সাত পাড়া পেরিয়ে। গন্ধে শেয়ালগুলো পর্য্যন্ত দিনের বেলা হাঁক ছেড়ে ডাকতে আরম্ভ করে নির্ভয়ে, লোভে কি ক্ষোভে জানিনে; কাক-গুলো জমির উপর ঠোঁট গুঁজে দিয়ে মরিয়া হয়ে পাখা ঝাপটায় তিনঘণ্টা ধরে। এ তো গেল তরকারী। আর জালা জালা ভর্ত্তি ছিল কাঙ্চুটোর সাঙ্চানি। সেদেশের পাকা পাকা আঁকস্যুটো ফলের ছোবড়া-চোঁয়ানো। এই সঙ্গে মিষ্টান্ন ছিল ইক্‌টিকুটির ভিকৃটিমাই, ঝুড়িভর্ত্তি। প্রথমে ওদের পোষা হাতি এসে পা দিয়ে সেগুলো দ'লে দিল, তারপরে ওদের দেশের সব চেয়ে বড়ো জানো-য়ার, মানুষে গোরুতে সিঙ্গিতে মিশোল তাকে ওরা বলে গাণ্ডিসাঙ্ডুং, তার কাঁটাওয়ালা জিব দিয়ে চেটে চেটে কতকটা নরম করে আনলে। তারপরে, তিনশো লোকের পাতের সামনে দমাদ্দম হামানদিস্তার শব্দ উঠতে লাগল। ওরা বলে, এই ভীষণ শব্দ শুনলেই ওদের জিবে জল আসে; দূর পাড়া থেকে শুনতে পেয়ে ভিখারি আসে দলে দলে। খেতে খেতে যাদের দাঁত ভেঙে যায় তারা সেই ভাঙা দাঁত দান ক'রে যায় বাড়ির কর্ত্তাকে। তিনি সেই ভাঙা দাঁত ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেন জমা ক'রে রাখতে, উইল করে দিয়ে যান ছেলেদের। যার তবিলে যত দাঁত তার তত নাম। অনেকে লুকিয়ে অন্যের সঞ্চিত দাঁত কিনে নিয়ে নিজের ব'লে চালিয়ে দেয়। এই নিয়ে বড়ো বড়ো মকদ্দমা হয়ে গেছে। হাজারদাঁতীরা পঞ্চাশদাঁতীর ঘরে মেয়ে দেয় না। একজন সামান্য পনেরো দাঁতী ওদের কেট্‌কু নাড়ু খেতে গিয়ে হঠাৎ দম আট্‌কিয়ে মারা গেল, হাজারদাঁতীর পাড়ায় তাকে পোড়াবার লোক পাওয়াই গেল না।

তাকে লুকিয়ে ভাসিয়ে দিলে চৌচঙ্গি নদীর জলে। তাই নিয়ে নদীর দুই ধারের লোকেরা খেসারতের দাবি ক'রে নালিশ করেছিল, লড়েছিল প্রিভি-কৌন্সিল পর্য্যন্ত।

আমি হাঁপিয়ে উঠে বললুম, থামো, থামো, কিন্তু জিগেস করি, তুমি যে কাহিনীটা আওড়ালে তার বিশেষ গুণটা কী।

ওর গুণটা এই, এটা কুলের আঁঠির চাটনি নয়। যা কিছুই জানিনে তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার সখ মেটালে কোনো নালিশের কারণ থাকে না। কিন্তু এতেও যে আছে উঁচুদরের হাসি তা আমি বলিনে। বিশ্বাস করবার অতীত যা তাকেও বিশ্বাস করবার যোগ্য করতে পারো যদি তাহোলেই অদ্ভুত রসের গল্প জমে। নেহাৎ বাজারে-চল্‌তি ছেলে-ভোলাবার শস্তা অত্যুক্তি যদি তুমি বানাতে থাকো তাহোলে তোমার অপযশ হবে এই আমি ব'লে রাখলুম।

আমি বললেম, আচ্ছা এমন ক'রে গল্প বলব, যাতে পুপুদিদির বিশ্বাস ভাঙতে ওঝা ডাকতে হবে।

ভালো কথা, কিন্তু লাটসাহেবের বাড়িতে যাওয়া বলতে কী বোঝায়।

বোঝায়, তুমি বিদায় নিলেই ছুটি পাই। একবার বসলে উঠতে চাও না, তাই "তুমি যাও" অনুরোধটা সামান্য একটু ঘুরিয়ে বলতে হোলো।

বুঝেছি, আচ্ছা তবে চললুম।

৬

সার্কাস দেখে আসার পর থেকে পুপুদিদির মনটা যেন বাঘের বাসা হয়ে উঠল। বাঘের সঙ্গে বাঘেব মাসিব সঙ্গে সর্ব্বদা তার আলাপ চলছে। আমরা কেউ যখন থাকিনে তখনি ওদের মজলিস জমে। আমাব কাছে নাপিতের খবর নিচ্ছিল—আমি বললুম, নাপিতের কী দরকার। পুপু জানালে, বাঘ ওকে অত্যন্ত ধরে পড়েছে; খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে ওর গোঁফ, ও কামাতে চায়।

আমি জিগেস করলেম, গোঁফ কামানোর কথা ওর মনে এল কী ক'রে।

পুপু বললে, চা খেয়ে বাবার পেয়ালায় তলানি যেটুকু বাকি থাকে আমি বাঘকে খেতে দিই। সেদিন তাই খেতে এসে ও দেখতে পেয়েছিল পাঁচু বাবুকে; ওর বিশ্বাস, গোঁফ কামালে ওর মুখখানা দেখাবে ঠিক পাঁচু বাবুরই মতো।

আমি বললুম, সেটা নিতান্ত অন্যায় ভাবেনি। কিন্তু একটু মুস্কিল আছে। কামানোর সুরুতেই নাপিতকে যদি শেষ ক'রে দেয় তাহোলে কামানো শেষ হবেই না।

শুনেই ফস্ ক'রে পুপের মাথায় বুদ্ধি এল, ব'লে ফেললে, জানো দাদামশায়, বাঘরা কখ্খনো নাপিতকে খায় না।

আমি বললুম, বলো কী। কেন বলো দেখি।

খেলে ওদের পাপ হয়।

ওঃ তাহোলে কোনো ভয় নেই। এক কাজ করা যাবে, চৌরঙ্গীতে সাহেব-নাপিতের দোকানে নিয়ে যাওয়া যাবে।

পুপে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, হাঁ হাঁ ভারি মজা হবে। সাহেবের মাংস নিশ্চয় খাবে না, ঘেন্না করবে।

খেলে গঙ্গাস্নান করতে হবে। খাওয়া-ছোঁওয়ায় বাঘের এত বাছবিচার আছে, তুমি জানলে কী করে দিদি।

পুপু খুব সেয়ানার মতো মুখ টিপে হেসে বললে, আমি সব জানি।

—পৃঃ ৫১

আর, আমি বুঝি জানিনে।

কী জানো, বলো তো।

ওরা কখনো চাষী কৈবর্ত্তর মাংস খায় না ; বিশেষত যারা গঙ্গার পশ্চিম-পারে থাকে। শাস্ত্রে বারণ।

আর, যারা পূব পারে থাকে ?

তারা যদি জেলে কৈবর্ত্ত হয় তো সেটা অতি পবিত্র মাংস। সেটা খাবার নিয়ম বাঁ থাবা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

বাঁ থাবা কেন।

ঐটে হচ্চে শুদ্ধরীতি। ওদের পণ্ডিতরা ডান থাবাকে নোংরা বলে। একটি কথা জেনে রাখো দিদি, নাপতিনীদের পরে ওদের ঘেন্না। নাপতিনীরা যে মেয়েদের পায়ে আল্‌তা লাগায়।

তা লাগালেই বা।

সাধু বাঘেরা বলে, আলতাটা রক্তের ভান—ওটা আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে বের করা রক্ত নয়—ওটা মিথ্যাচার। এ রকম কপটাচরণকে ওরা অত্যন্ত নিন্দে করে। একবার একটা বাঘ ঢুকেছিল পাগড়িওয়ালার ঘরে—সেখানে ম্যাজেণ্টা গোলা ছিল গামলায়। রক্ত মনে ক'রে মহা খুসি হয়ে মুখ ডুবলে তার মধ্যে। সে একেবারে পাকা রং। বাঘের দাড়ি গোঁফ তার দুই গাল লাল টক্‌টকে হয়ে উঠল। নিবিড় বনে যেখানে বাঘেদের পুরুতপাড়া মোষমারা গ্রামে,—সেইখানে আসতেই ওদের আঁচাড়ি শিরোমণি ব'লে উঠল,এ কী কাণ্ড, তোমার সমস্ত মুখ লাল কেন। ও লজ্জায় প'ড়ে মিথ্যে ক'রে বললে,—গণ্ডার মেরে তার রক্ত খেয়ে এসেছি। ধরা পড়ে গেল মিথ্যে। পণ্ডিতজি বললে, নখে তো রক্তের চিহ্ন দেখিনে, মুখ শুঁকে বললে, মুখে তো রক্তের গন্ধ নেই।—সবাই ব'লে উঠল, ছি ছি! এ তো রক্তও নয়, পিত্তও নয়, মগজও নয় মজ্জাও নয়—নিশ্চয় মানুষের পাড়ায় গিয়ে এমন একটা রক্ত খেয়েছে যা নিরামিষ রক্ত—

যা অশুচি। পঞ্চায়েৎ বসে গেল। কামড়-বিশারদ মশায় হুঙ্কার দিয়ে বললে, প্রায়শ্চিত্ত করা চাই। করতেই হোলো।

যদি না করত।

সর্ব্বনাশ। ও যে পাঁচ-পাঁচটা মেয়ের বাপ; বড়ো বড়ো খর-নখিনীর গৌরীদানের বয়স হয়ে এসেছে। পেটের নিচে ল্যাজ গুটিয়ে সাত গণ্ডা মোষ পণ দিতে চাইলেও বর জুটবে না। এব চেয়েও ভয়ঙ্কব শাস্তি আছে।

কী রকম।

ম'লে শ্রাদ্ধ করবার জন্যে পুরুত পাওয়া যাবে না, শেষ কালে হয়তো বেত-জঙ্গল গাঁ থেকে নেকড়ে বেঘো পুরুৎ আনাতে হবে সে ভারি লজ্জা - সাত পুরুষের মাথা হেঁট।

শ্রাদ্ধ নাইবা হোলো।

শোনো একবার। বাঘের ভূত যে না খেয়ে মরবে।

সে তো মরেইছে, আবার মরবে কী ক'রে।

সেই তো আরো বিপদ। না খেয়ে মরা ভালো কিন্তু ম'রে না খেয়ে বেঁচে থাকা যে বিষম দুর্গ্রহ।

পুপুদিদিকে ভাবিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ বাদে ভুরু কুঁচকিয়ে বললে, ইংরেজের ভূত তাহোলে খেতে পায় কী ক'রে।

তারা বেঁচে থাকতে যা খেয়েছে তাতেই তাদের সাতজন্ম অমনি চ'লে যায়। আমরা যা খাই তাতে বৈতরণী পার হবার অনেক আগেই পেট চোঁ চোঁ করতে থাকে।

সন্দেহ মীমাংসা হোতেই পুপে জিগেস করলে, প্রায়শ্চিত্ত কী রকম হোলো।

আমি বললুম, হাঁকবিদ্যাবাচস্পতি বিধান দিলে যে বাঘাচণ্ডীতলার দক্ষিণপশ্চিম কোণে কৃষ্ণপঞ্চমী তিথি থেকে সুরু ক'রে অমাবস্যার আড়াই

—প: ৫৬

পহর রাত পর্য্যন্ত ওকে কেবল খ্যাঁকশেয়ালির ঘাড়ের মাংস খেয়ে থাকতে হবে, তা-ও, হয় ওর পিসতুতো বোন কিম্বা মাসতুতো শ্যালার মেজো ছেলে ছাড়া আর কেউ শিকার করলে হবে না,—আর ওকে খেতে হবে পিছনের ডানদিকের থাবা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে। এত বড়ো শাস্তির হুকুম শুনেই বাঘের গা বমি-বমি ক'রে এল ; চার পায়ে হাত জোড় ক'রে হাউ হাউ করতে লাগল।

কেন, কী এমন শাস্তি।

বলো কী, খ্যাঁকশিয়ালীর মাংস!—যতদূর অশুচি হোতে হয়। বাঘটা দোহাই পেড়ে বললে, আমাকে বরঞ্চ নেউলের ল্যাজ খেতে বলো সেও রাজি, কিন্তু খ্যাঁকশেয়ালির ঘাড়ের মাংস!

শেষকালে কি খেতে হোলো।

হোলো বই কী।

দাদামশায়, বাঘেরা তাহোলে খুব ধার্ম্মিক।

ধার্ম্মিক না হোলে কি এত নিয়ম বাঁচিয়ে চলে। সেইজন্যেই তো শেয়ালরা ওদের ভারি ভক্তি করে। বাঘের এঁটো প্রসাদ পেলে ওরা বর্ত্তিয়ে যায়। মাঘের ত্রয়োদশীতে যদি মঙ্গলবার পড়ে তাহোলে সেদিন ভোর রাত্তিরে ঠিক দেড় প্রহর থাকতে বুড়ো বাঘের পা চেটে আসা শেয়ালদের ভারি পুণ্যকর্ম্ম। কত শেয়াল প্রাণ দিয়েছে এই পুণ্যের জন্যে।

পুপুর বিষম খট্‌কা লাগল। বললে, বাঘরা এতই যদি ধার্ম্মিক হবে তাহোলে জীব হত্যে ক'রে কাঁচা মাংস খায় কী ক'রে।

সে বুঝি যে-সে মাংস। ওযে মন্ত্র দিয়ে শোধন করা।

কী রকম মন্ত্র।

ওদের সনাতন হালুম মন্ত্র। সেই মন্ত্র প'ড়ে তবে ওরা হত্যা করে। তাকে কি হত্যা বলে।

যদি হালুম মন্ত্র বলতে ভুলে যায়।

বাঘপুঙ্গব-পণ্ডিতের মতে তাহোলে ওরা বিনামন্ত্রে যে জীবকে মারে পরজন্মে সেই জীব হয়েই জন্মায়। ওদের ভাবি ভয় পাছে মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়।

কেন।

ওরা বলে, মানুষের সর্ব্বাঙ্গ টাক-পড়া, কী কুশ্রী! তার পরে, সামান্য একটা লেজ, তাও নেই মানুষের দেহে। পিঠের মাছি তাড়াবার জন্যেই ওদের বিয়ে করতে হয়। আবার দেখো না, ওরা খাড়া দাঁড়িয়ে সঙের মতো দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে—দেখে আমরা হেসে মরি। আধুনিক বাঘের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো জ্ঞানী শার্দ্দৌল্যতত্ত্বরত্ন বলেন, জীবসৃষ্টির শেষের পালায় বিশ্বকর্ম্মার মালমসলা যখন সমস্তই কাবার হয়ে গেল তখনি মানুষ গড়তে তাঁর হঠাৎ সখ হোলো।--তাই বেচারাদের পায়ের তলার জন্যে থাবা দূরে থাক্ কয়েক টুক্‌রো খুরের জোগাড় করতে পারলেন না, জুতো প'রে তবে ওরা পায়ের লজ্জা নিবারণ করতে পারে—আর গায়ের লজ্জা ঢাকে ওরা কাপড়ে জড়িয়ে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ওরাই হোলো লজ্জিত জীব। এত লজ্জা জীবলোকে আর কোথাও নেই।

বাঘেদের বুঝি ভারি অহঙ্কার।

ভয়ঙ্কর। সেইজন্যেই তো ওরা এত ক'রে জাত বাঁচিয়ে চলে। জাতের দোহাই পেড়ে একটা বাঘের খাওয়া বন্ধ করেছিল একজন মানুষের মেয়ে,—তাই নিয়ে আমাদের সে একটা ছড়া বানিয়েছে।

তোমার মতো সে আবার ছড়া বানাতে পারে না কি।

তার নিজের বিশ্বাস সে পারে,এই তর্ক নিয়ে তো পুলিস ডাকা যায় না।

আচ্ছা শোনাও না।

তবে শোনো।

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ,
গায়ে তার কালো কালো দাগ।

বেহারাকে খেতে ঘরে ঢুকে
আয়নাটা পড়েছে সমুখে।
এক ছুটে পালালো বেহারা,
বাঘ দেখে আপন চেহারা।
গাঁ গাঁ ক'রে ডেকে ওঠে রাগে,
দেহ কেন ভরা কালো দাগে।
ঢেঁকিশালে পুঁটু ধান ভানে,
বাঘ এসে দাঁড়াল সেখানে।
ফুলিয়ে ভীষণ দুই গোঁফ,
বলে—চাই গ্লিসেরিন সোপ।—
পুঁটু বলে— ও কথাটা কী যে
জন্মেও জানিনে তা নিজে।
ইংরেজি টিংরেজি কিছু
শিখিনিতো, জাতে আমি নীচু।—
বাঘ বলে—কথা বলো ঝুঁটো,
নেই কি আমার চোখ দুটো ?
গায়ে কিসে দাগ হোলো লোপ
না মাখিলে গ্লিসেরিন সোপ ?—
পুঁটু বলে—আমি কালো কুষ্টি,
কখনো মাখিনি ও জিনিষটি।
কথা শুনে পায় মোর হাসি,
নই মেম সাহেবের মাসি।—
বাঘ বলে—নেই তোর লজ্জা ?
খাব তোর হাড় মাস মজ্জা।—
পুঁটু বলে—ছি ছি ওরে বাপ,
মুখেও আনিলে হবে পাপ।

জানো না কি আমি অস্পৃশ্য,
মহাত্মা গাঁধিজির শিষ্য ?
আমার মাংস যদি খাও
জাত যাবে জানো নাকি তাও ?
পায়ে ধরি করিও না রাগ !—
—ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে—বলে বাঘ।—
—আরে ছি ছি, আরে রাম রাম,
বাঘ্‌না-পাড়ায় বদনাম
রটে যাবে , ঘরে মেয়ে ঠাসা,
ঘুচে যাবে বিবাহের আশা।
দেবী বাঘা চণ্ডীর কোপে।
কাজ নেই গ্লিসেরিন সোপে।—

জানো পুপুদিদি, আধুনিক বাঘেদের মধ্যে ভাবি একটা কাণ্ড চলছে—যাকে বলে প্রগতি, প্রচেষ্টা। ওদের প্রগতিওয়ালা প্রচারকেরা বাঘ-সমাজে ব'লে বেড়াচ্চে যে, অস্পৃশ্য ব'লে খাদ্য বিচার করা পবিত্র জন্তু-আত্মার প্রতি অবমাননা। ওরা বলছে, আজ থেকে আমরা যাকে পাব তাকেই খাব, বাঁ থাবা দিয়ে খাব, ডান থাবা দিয়ে খাব, পিছনের থাবা দিয়েও খাব, হালুমমন্ত্র প'ড়েও খাব,না প'ড়েও খাব,—এমন কি বৃহস্পতিবারেও আমরা আঁচড়ে খাব,শনিবারেও আমরা কামড়ে খাব। এত ঔদার্য্য। এই বাঘেরা যুক্তিবাদী এবং সর্ব্বজীবে এদের সম্মানবোধ অত্যন্ত ফলাও। এমন কি এরা পশ্চিমপারের চাষী কৈবর্ত্ত-দেরও খেতে চায় এতই এদের উদার মন। ঘোরতর দলাদলি বেধে গেছে—প্রাচীনরা নব্য সম্প্রদায়কে নাম দিয়েছে চাষী-কৈবর্ত্ত-খেগো—এই নিয়ে মহা হাসাহাসি পড়েছে।

পুপু বললে, আচ্ছা দাদামশায়, তুমি কখনো বাঘের উপর কবিতা লিখেছ ?

হার মানতে মন গেল না। বল্‌লুম, হাঁ লিখেছি।

শোনাও না।

গম্ভীর সুরে আবৃত্তি ক'রে গেলুম —

তোমার সৃষ্টিতে কভু শক্তিরে করো না অপমান,
হে বিধাতা,—হিংসারেও করেছ প্রবল হস্তে দান
আশ্চর্য্য মহিমা এ কী। প্রখর-নখর বিভীষিকা,
সৌন্দর্য্য দিয়েছ তারে দেহধারী যেন বজ্রশিখা,
যেন ধূর্জ্জটির ক্রোধ। তোমার সৃষ্টির-ভাঙে বাঁধ
ঝঞ্ঝা উচ্ছৃঙ্খল, করে তোমার দয়ার প্রতিবাদ,
বনের যে দস্যু সিংহ, ফেন-জিহ্ব ক্ষুব্ধ সমুদ্রের
যে উদ্ধত ঊর্দ্ধ-ফণা, ভূমিগর্ভে দানব যুদ্ধের
ডমরুনিঃস্বনী স্পর্দ্ধা, গিরিবক্ষভেদী বহ্নিশিখা
যে আঁকে দিগন্তপটে আপন জ্বলন্ত জয়টিকা।
প্রলয়নর্ত্তিনী বন্যা, বিনাশের মদিরবিহ্বল
নির্লজ্জ নিষ্ঠুর - এই যত বিশ্ববিপ্লবীর দল
প্রচণ্ড সুন্দর। জীবলোকে যে দুর্দ্দান্ত আনে ত্রাস
হীনতালাঞ্ছনে সে তো পায় না তোমার পরিহাস।

চুপ করে রইল পুপু। আমি বললুম,—কী দিদি, ভালো লাগল না বুঝি।

ও কুণ্ঠিত হয়ে বললে, না না, ভালো লাগবে না কেন। কিন্তু এর মধ্যে বাঘটা কোথায়।

আমি বললুম, যেমন সে থাকে ঝোপের মধ্যে, দেখা যায় না তবু আছে ভয়ঙ্কর গোপনে।

পুপু বললে, অনেকদিন আগে গ্লিসেরিন-সোপ-খোঁজা বাঘের কথা আমাকে বলেছিলে। তার খবরটা কোথা থেকে পেলে সে।

আমার কথা ও করে চুরি, নিজের মুখে সেটা দেয় বসিয়ে।

কিন্তু—

"কিন্তু" না তো কী। লিখেছে ভালোই।

কিন্তু—

হাঁ, ঠিক কথা। আমি অমন করে লিখিনে, হয়তো লিখতে পারিনে। আমার মালটা ও চুরি করে, তারপরে যখন পালিস ক'রে দেয়, তখন চেনা শক্ত হয়—এমন ঢের দেখেছি। ঠিক ঐ রকম আর একটি ছড়া বানিয়েছে।—

শোনাও না।

আচ্ছা শোনো তবে।

সুঁদর বনের কেঁদো বাঘ,
সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ।
যথাকালে ভোজনের কম হোলে ওজনের
হোত তার ঘোরতর রাগ।
একদিন ডাক দিল গাঁ গাঁ,
বলে—তোর গিন্নিকে জাগা।
শোন্ বটুরাম ন্যাড়া পাঁচ জোড়া চাই ভ্যাড়া,
এখনি ভোজের পাত লাগা।—
বটু বলে—এ কেমন কথা,
শিখেছ কি এই ভদ্রতা।
এত রাতে হাঁকাহাঁকি ভালো না, জানো না তা কি,
আদবের এ যে অন্যথা।
মোর ঘর নেহাৎ জঘন্য,
মহাপশু, হেথায় কী জন্য।
ঘরেতে বাঘিনীমাসি পথ চেয়ে উপবাসী
তুমি খেলে মুখে দেবে অন্ন।

সেথা আছে গোসাপের ঠ্যাং।
আছে তো শুট্‌কে কোলা ব্যাং।
আছে বাসি খরগোষ, গন্ধে পাইবে তোষ,
চলে যাও নেচে ড্যাং ড্যাং।
নইলে কাগজে প্যারাগ্রাফ
রটিবে, ঘটিবে পরিতাপ।—
বাঘ বলে—রামো রামো, বাক্যবাগীশ থামো।
বকুনির চোটে ধরে হাঁপ।
তুমি ন্যাড়া, আস্ত পাগল,
বেরোও তো, খোলো তো আগল।
ভালো যদি চাও তবে আমারে দেখাতে হবে
কোন ঘরে পুষেছ ছাগল।—
বটু কহে,—এ কী অকরণ,
ধরি তব চতুশ্চরণ,
জীব বধ মহাপাপ তারো বেশি লাগে শাপ
পরধন করিলে হরণ।—
বাঘ শুনে বলে,—হরি হরি,
না খেয়ে আমিই যদি মরি,
জীবেরই নিধন তাহা, সহমরণেতে আহা
মরিবে যে বাঘী স্নুন্দরী।
অতএব ছাগলটা চাই,
না হোলে তুমিই আছ ভাই।—
এত বলি তোলে থাবা, বটুরাম বলে,—বাবা,
চলো ছাগলেরই ঘরে যাই।—
দ্বার খুলে বলে,—পড়ো ঢুকে,
ছাগল চিবিয়ে খাও স্নুখে।—

বাঘ সে ঢুকিল যেই দ্বিতীয় কথাটি নেই
বাহিরে শিকল দিল রুখে।
বাঘ বলে—এ তো বোঝা ভার,
তামাসার এ নহে আকার।
পাঠার দেখিনে টিকি, ল্যাজের শিকির শিকি
নেই তো, শুনি নে ভ্যাভ্যাকার।
ওরে হিংস্থক সয়তান,
জীবের বধিতে চাস্ প্রাণ,
ওরে ক্রূর, পেলে তোরে থাবায় চাপিয়া ধ'রে
রক্ত শুষিয়া করি পান।
ঘরটাও ভীষণ ময়লা।—
বটু বলে,—মহেশ গয়লা
ও ঘরে থাকিত,—আজ থাকে তোর যমরাজ
আর থাকে পাথুরে কয়লা।—
গোঁফ ফুলে ওঠে যেন ঝাঁটা,
বাঘ বলে,—গেল কোথা পাঁঠা!—
বটুরাম বলে নেচে,— এই পেটে তলিয়েছে,
খুঁজিলে পাবে না সারা গাঁ-টা॥—

ভালো লাগল?

তা যা-ই বলো দাদামশায়, কিন্তু বাঘের ছড়া খুব ভালো লিখেছে।

আমি বললুম, তা হবে, হয় তো ভালোই লিখেছে। কিন্তু ও ভালো লেখে কি আমি ভালো লিখি সে সম্বন্ধে শেষ অভিমতটা দেবার জন্যে অন্তত আরো দশটা বছর অপেক্ষা কোরো।

পুপু বললে, আমার বাঘ কিন্তু আমাকে খেতে আসে না।

—পৃঃ ৬৫

সে তো তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখেই বুঝতে পারছি। তোমার বাঘ কী করে?

রাত্তিরে যখন শুয়ে থাকি বাইরে থেকে ও জানলা আঁচড়ায়। খুলে দিলেই হাসে।

তা হোতে পারে, ওরা খুব হাসিয়ে জাত। ইংরেজিতে যাকে বলে হিউ-মরাস্। কথায় কথায় দাঁত বের করে।

৭

পুপে এসে জিগেস করলে, দাদামশায় তুমি যে বললে শনিবারে সে আসবে তোমার নেমন্তন্নে। কী হোলো।

সবই ঠিক হয়েছিল। হাজি মিঞা শিক্‌কাবাব বানিয়েছিল, তোফা হয়েছিল খেতে।

তারপরে।

তারপরে নিজে খেলুম তার বারো আনা আন্দাজ, আর পাড়ার কালু ছোঁড়াটাকে দিলুম বাকিটুকু। কালু বললে, দাদাবাবু, এযে আমাদের কাঁচকলার বড়ার চেয়ে ভালো।

সে কিছু খেল না।

জো কী।

সে এল না।

সাধ্য কী তার।

তবে সে আছে কোথায়।

কোথাও না।

ঘরে।

না।

দেশে।

না।

বিলেতে।

না।

তুমি যে বলছিলে, আণ্ডামানে যাওয়া ওর একরকম ঠিক হয়ে আছে। গেল না কি।

দরকার হোলো না।

তা হোলে কী হোলো আমাকে বলছ না কেন।

ভয় পাবে কিম্বা দুঃখ পাবে তাই বলিনে।

তা হোক বলতে হবে।

আচ্ছা তবে শোনো। সেদিন ক্লাস পড়াবার খাতিরে আমার পড়ে নেবার কথা ছিল 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন'। একসময় হঠাৎ দেখি, সেটা রয়েছে পড়ে, হাতে উঠে এসেছে "পাঁচুপাকড়াশির পিস্‌শাশুড়ি"। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, রাত হবে তখন আড়াইটা। স্বপ্ন দেখছি, গরম তেল জ্বলে উঠে আমাদের কিনি বামনীর মুখ বেবাক্ গিয়েছে পুড়ে, সাত দিন সাত রাত্তির হত্যে দিয়ে তারকেশ্বরের প্রসাদ পেয়েছে দু'কৌটো লাহিড়ি কোম্পানীর মূনলাইট স্নো, তাই মাখছে মুখে ঘ'ষে ঘ'ষে। আমি বুঝিয়ে বললুম, ওতে হবে না গো, মোষের বাচ্ছার গালের চামড়া কেটে নিয়ে মুখে জুড়তে হবে নইলে রঙে মিলবে না। শুনেই আমার কাছে শওয়া তিনটাকা ধার নিয়ে সে ধর্ম্মতলার বাজারে মোষ কিনতে দৌড়েছে।

এমন সময় ঘরে একটা কী শব্দ শোনা গেল, কে যেন হাওয়ার তৈরি চটিজুতো হুস হুস ক'রে টানতে টানতে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্চে। ধড়ফড় ক'রে উঠলেম, উস্কে দিলেম লণ্ঠনটা। ঘরে একটা কিছু এসেছে দেখা গেল কিন্তু সে যে কে, সে যে কী, সে যে কেমন, বোঝা গেল না। বুক ধড়ফড় করছে তবু জোর গলা ক'রে হেঁকে বললুম, কে হে তুমি, পুলিস ডাক্‌ব না কি।

-পৃঃ ৬৭

অদ্ভুত হাঁড়িগলায় এই জীবটা বললে, কী দাদা চিনতে পারছ না। আমি যে তোমার পুপেদিদির সে। এখানে যে আমার নেমন্তন্ন ছিল।

আমি বললুম, বাজে কথা বলছ, এ কী চেহারা তোমার।

সে বললে, চেহারাখানা হারিয়ে ফেলেছি।

হারিয়ে ফেলেছ। মানে কী হোলো।

মানেটা বলি। পুপেদিদির ঘরে ভোজ, সকাল সকাল নাইতে গেলেম। বেলা তখন সবেমাত্র দেড়টা। তেলেনিপাড়ার ঘাটে বসে ঝামা দিয়ে ক'সে মুখ মাজ্‌ছিলুম; মাজার চোটে আরামে এমনি ঘুম এল যে, ঢুলতে ঢুলতে ঝুপ্ ক'রে পড়লুম জলে। তারপরে কী হোলো জানিনে। উপরে এসেছি, কি নিচে কি কোথায় আছি জানিনে, পষ্ট দেখা গেল, আমি নেই।

নেই।

তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—

আরে আরে গা ছুঁতে হবে না, বলে যাও।

চুলকুনি ছিল গায়ে, চুলকাতে গিয়ে দেখি, না আছে নখ, না আছে চুলকনি। ভয়ানক দুঃখ হোলো। হাউহাউ ক'রে কাঁদতে লাগলুম, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে যে হাউহাউটা বিনামূল্যে পেয়েছিলুম, সে গেল কোথায়। যত চেঁচাই চেঁচানোও হয় না কান্নাও শোনা যায় না। ইচ্ছে হোলো মাথা ঠুকি বটগাছটাতে, মাথাটার টিকি খুঁজে পাইনে কোথাও। সব চেয়ে দুঃখ, বারোটা বাজল, ক্ষিদে কই ক্ষিদে কই ব'লে পুকুর ধারে পাক খেয়ে বেড়াই, ক্ষিদে বাঁদরটার চিহ্ন মেলে না।

কী বক্‌ছ তুমি, একটু থামো।

ও দাদা, দোহাই তোমার থামতে বোলো না। থামবার দুঃখ যে কী অ-থামা মানুষ সে তুমি কী বুঝবে। থামব না, আমি থামব না, কিছুতেই থামব না, যতক্ষণ পারি থামব না।

—পৃঃ ৬৯

এই ব'লে ধুপধাপ ধুপধাপ ক'রে লাফাতে লাগল, শেষকালে ডিগবাজি খেলা সুরু করলে আমার কার্পেটের উপর, জলের মধ্যে শুশুকের মতো।

করছ কী তুমি।

দাদা, একেবারে বাদশাহী থামা থেমেছিলুম, আর কিছুতেই থামছিনে। মারধোর যদি করো সেও লাগবে ভালো। আস্ত কিলের যোগ্য পিঠ নেই যখন জানতে পারলুম, তখন সাতকড়ি পণ্ডিতমশায়ের কথা মনে ক'রে বুক ফেটে যেতে চাইল, কিন্তু বুক নেই তো ফাটবে কী। কই মাছের যদি এই দশা হোত তাহোলে বামুনঠাকুরের হাতে পায়ে ধরত তাকে একবার তপ্ত তেলে এপিঠ ওপিঠ ওলটাতে পালটাতে। আহা, যে পিঠখানা হারিয়েছে সেই পিঠে পণ্ডিতমশায়ের কত কীলই খেয়েছি, ইঁট দিয়ে তৈরি খইয়ের মোওয়াগুলোর মতো। আজ মনে হয় উঃ—দাদা, একবার কিলিয়ে দাও খুব ক'রে দমাদম। —ব'লে আমার কাছে এসে পিট দিলে পেতে।

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, যাও যাও, সরে যাও।

ও বললে, কথাটা শেষ ক'রে নিই। একখানা গা খুঁজে খুঁজে বেড়ালুম গাঁয়ে গাঁয়ে। বেলা তখন তিন পহর। যতই রোদে বেড়াই কিছুতেই রোদে পুড়ে সারা হচ্চিনে, এই দুঃখটা যখন অসহ্য এমন সময় দেখি আমাদের পাতু-খুড়ো মুচিখোলার বটগাছতলায় গাঁজা খেয়ে শিবনেত্র। মনে হোলো তার প্রাণপুরুষটা বিন্দু হয়ে ব্রহ্মতালুর চূড়োয় এসে জোনাক পোকার মতো মিট্‌মিট্ করছে। বুঝলুম হয়েছে সুযোগ, নাকের গর্ত্ত দিয়ে আত্মারামকে ঠেসে চালিয়ে দিলুম তার দেহের মধ্যে, নতুন নাগ্‌রা জুতোর ভিতরে যেমন ক'রে পা-টা ঠেসে গুঁজতে হয়। সে হাঁপিয়ে উঠে ভাঙা গলায় ব'লে উঠল, কে তুমি বাবা, ভিতরে জায়গা হবে না। তখন তার গলাটা পেয়েছি দখলে, বললুম, তোমার হবে না জায়গা, আমার হবে। বেরোও তুমি।

সে গোঁ গোঁ করতে করতে বললে, অনেকখানি বেরিয়েছি, একটু বাকি। ঠেলা মারো। দিলুম ঠেলা, হুস্ ক'রে গেল বেরিয়ে।

—পৃঃ ৭৩

এদিকে পাতুখুড়োর গিন্নি এসে বললে, বলি ও পোড়ারমুখো।

কান জুড়িয়ে গেল। বললুম, বলো বলো আবার বলো, বড়ো মিষ্টি লাগছে, এমন ডাক যে আবার কোনোদিন শুনতে পাব এমন আশাই ছিল না।

বুড়ি ভাবলে ঠাট্টা করছি, ঝাঁটা আনতে গেল ঘরের মধ্যে। ভয় হোলো, পড়ে-পাওয়া দেহটা খোয়াই বুঝি। বাসায় এসে আয়নাতে মুখ দেখলুম, সমস্ত শরীর উঠল শিউরে। ইচ্ছে করল র‍্যাঁদা দিয়ে মুখটাকে ছুলে নিই।

গা-হারার গা এল কিন্তু চেহারাহারার চেহারাখানা সাত বাঁও জলের তলায়, তাকে ফিরে পাবার কী উপায়।

ঠিক এই সময়ে দীর্ঘবিচ্ছেদের পর খিদেটাকে পাওয়া গেল। একেবারে জঠর জুড়ে। সব ক'টা নাড়ী চোঁ চোঁ ক'রে উঠেছে এক সঙ্গে। চোখে দেখতে পাইনে পেটের জ্বালায়। যাকে পাই তাকে খাই গোছের অবস্থা। উঃ কী আনন্দ।

মনে পড়ল তোমার ঘরে পুপুদিদির নেমন্তন্ন। রেলভাড়ার পয়সা নেই। হেঁটে চলতে সুরু করলুম। চলার অসম্ভব মেহন্নতে কী যে আরাম সে আর কী বলব। স্ফূর্ত্তিতে একেবারে গলদ্‌ঘর্ম্ম। এক এক পা ফেলছি আর মনে মনে বলছি, থামছিনে, থামছিনে, চলছি তো চলছিই। এমন বেদম চলা জীবনে কখনো হয় নি। দাদা, পুরো একখানা গা নিয়ে বসে আছ কেদারায়, বুঝতেই পারো না কষ্টতে যে কী মজা। এই কষ্টে বুঝতে পারা যায় আছি বটে, খুব কষে আছি, ষোলো আনা পেরিয়ে গিয়ে আছি।

আমি বললুম, সব বুঝলুম, এখন কী করতে চাও বলো।

করবার দায় তোমারই, নেমন্তন্ন করেছিলে, খাওয়াতে হবে, সে কথা ভুললে চলবে না।

রাত এখন তিনটে সে কথা তুমিও ভুললে চলবে না।

তাহোলে চললুম পুপুদিদির কাছে।

খবরদার।

দাদা, ভয় দেখাচ্চ মিছে, মরার বাড়া গাল নেই। চললুম।

কিছুতেই না।

সে বললে, যাবই।

আমি বললুম, কেমন যাও দেখব।

সে বলতে লাগল, যাবই, যাবই, যাবই।

আমার টেবিলের উপর চ'ড়ে নাচতে নাচতে বললে, যাবই, যাবই, যাবই। শেষকালে পাঁচালির সুর লাগিয়ে গাইতে লাগল যাবই, যাবই, যাবই।

আর থাকতে পারলুম না। ধরলুম ওর লম্বা চুলের ঝুঁটি। টানা-টানিতে গা থেকে ঢিলে মোজার মতো, দেহটা সরসর ক'রে খ'সে ধপ্ ক'রে পড়ে গেল।

সর্ব্বনাশ। গাঁজাখোরের আত্মাপুরুষকে খবর দিই কী ক'রে। চেঁচিয়ে ব'লে উঠলুম, আরে আরে, শোনো শোনো, ঢুকে পড়ো এই গা-টার মধ্যে, নিয়ে যাও এটাকে।

কেউ কোথাও নেই। ভাবছি "আনন্দ বাজারে" বিজ্ঞাপন দেব।

পুপেদিদি এতখানি চোখ ক'রে বললে, সত্যি কি দাদামশায়।

আমি বললুম, সত্যির চেয়ে অনেক বেশি—গল্প।

৮

আমি তখন এম, এ ক্লাসের জন্যে এরিয়োপ্যাজিটিকার নোট লিখছি, মিলিয়ে দেখবার জন্যে বই পড়তে হচ্ছিল, ইণ্টরন্যাশনল্ মেলিফ্লুয়স্ অ্যাব্রা-ক্যাড্যাব্রা,আর পাত কেটে পরিশিষ্ট দেখছিলুম থ্রী হণ্ড্রেড্ ইয়র্স্ অফ ইণ্ডো-ইণ্ডিটর্মিনেশন্ বইখানার। লাইব্রেরি থেকে আনাতে দিয়েছি অনোম্যাটোপিইয়া অফ্ টিণ্টিন্যাব্যুলেশন্। এমন সময় হুড়মুড় করে এসে ঢুকল আমাদের সে।

আমি বললুম, হয়েছে কী, স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়েছে না কি।

ও বললে, নিশ্চয় দিত, যদি সে থাকৃত। কিন্তু কী কাণ্ড বাধিয়েছ বলো দেখি।

কেন কী হোলো।

আমাকে নিয়ে এ পর্য্যন্ত বিস্তর আজগবি গল্প বানিয়েছ। ভাগ্যে আমার নামটা দাওনি, নইলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো দায় হোত। দেখলুম, পুপুদিদির মজা লাগছে তাই সহ্য করেছি সব। কিন্তু এবার যে উল্টো হোলো।

কেন কী হোলো বলোই না।

তবে শোনো। পুপুদিদি কাল গিয়েছিল সিনেমায়। মোটরে উঠতে যাচ্ছে, আমি পিছন থেকে এসে বললুম, দিদিমণি, তোমার গাড়িতে আমাকে তুলে নিয়ে যাও। তারপরে কী আর বলব দাদা, একেবারে হিষ্টিরিয়া।

কী রকম।

হাতে চোখ ঢেকে চেঁচিয়ে উঠে দিদি বললে, যাও যাও, গাঁজাখোরের

গা চুরি ক'রে আমার গাড়িতে উঠতে পাবে না। চারদিক থেকে লোক এল ছুটে, আমাকে পুলিসে ধরে নিয়ে যায় আর কী। জীবনে অনেক নিন্দে শুনেছি কিন্তু এ রকম ওরিজিন্যাল নিন্দে শুনিনি কখনো। গাঁজাখোরের গা চুরি করা। আমার অতি বড়ো প্রাণের বন্ধুও এমন নিন্দে আমার নামে রটায়নি। বাড়ি ফিরে এসে সমস্ত ব্যাপারটা শোনা গেল। এ তোমারি কীর্তি।

আমারি তো বটে। কী করি বলো। তোমাকে নিয়ে আর কাঁহাতক গল্প বানাই। বয়স হয়ে গেছে, কলমটাকে যেন বাতে ধরল, পুপুদিদির ফরমাসমতো অসম্ভব গল্প বলার হালকা চাল আর নেই কলমের। তাই এই শেষ গল্পটাতে তোমাকে একেবারে খতম ক'রে দিয়েছি।

খতম হোতে রাজি নই দাদা। দোহাই তোমার, পুপুদিদির ভয় ভাঙিয়ে দাও। বুঝিয়ে বলো ওটা গল্প।

বলেছিলুম, কিন্তু ভয় ভাঙতে চায় না। নাড়ীতে জড়িয়ে গেছে। উপায় না দেখে স্বয়ং সেই পাতু গেঁজেলকে আনলুম তার সামনে, উল্টো হোলো ফল। পাতুর গা-খানা প'রে যে তুমিই ঘুরে বেড়াচ্ছ তারি প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে গেল।

তাহোলে দাদা, গল্পটাকে উল্‌টিয়ে দাও, ধনুষ্টঙ্কারে মরুক পাতু। গাঁজাখোরের গা-খানাকে নিমতলার ঘাটে পুড়িয়ে ফেলো। ঘটা ক'রে তার শ্রাদ্ধ করব, পুপুদিদিকে করব তাতে নেমন্তন্ন; খরচ যত পড়ে দেব নিজের পকেট থেকে। আমি হলুম দিদির গল্পের বহুরূপী, হঠাৎ এত বড়ো পদ থেকে আমাকে অপদস্থ করলে বাঁচব না।

আচ্ছা গল্পের উল্টোরথে তোমাকে পুপুদিদির ঘরে আবার ফিরিয়ে আনব।

*   *   *   *   *

পরদিন সন্ধ্যার সময় সে এল, আমি সুরু করলুম গল্পটা।—

বললুম, পাতুর স্ত্রী স্বামীর স্বত্ব পাবার জন্যে তোমার নামে আদালতে নালিশ করেছে।

এইটুকু শুনেই সে ব'লে উঠল, এ চলবে না দাদা। পাতুর স্ত্রীকে তুমি চক্ষে দেখোনি তো। মকদ্দমায় ঐ মহিলাটি যদি জেতে তাহোলে যে আসামী পক্ষ আফিম খেয়ে মরবে।

ভয় কী, কথা দিচ্চি, হার হোক, জিত হোক, টিঁকিয়ে রাখব তোমাকে।

আচ্ছা ব'লে যাও।

হাত জোড় ক'রে তুমি হাকিমকে বললে, হজুর ধর্ম্মাবতার সাতপুরুষে আমি ওর স্বামী নই।

উকিল চোখ রাঙিয়ে বললে, স্বামী নও তার মানে কী।

তুমি বললে, তার মানে, এ পর্য্যন্ত আমি ওকে বিয়ে করিনি, দ্বিতীয় আর কোনো মানে আপাতত কিছুতেই ভেবে পাচ্চিনে।

রামসদয় মোক্তার খুব একটা ধমক দিয়ে বললে, আলবৎ তুমি ওর স্বামী, মিথ্যে কথা বোলো না।

তুমি জজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললে, জীবনে বিস্তর মিথ্যে বলেছি, কিন্তু ঐ বুড়িকে সজ্ঞানে স্বইচ্ছায় বিয়ে করেছি, এত বড়ো দিগ্‌গজ মিথ্যে বানিয়ে বলবার তাকৎ আমার নেই। মনে করতে বুক কেঁপে ওঠে।

তখন ওরা সাক্ষী তলব করলে পঁয়ত্রিশজন গাঁজাখোরকে। একে একে তারা গাঁজাটেপা আঙুল তোমার মুখে বুলিয়ে বলে গেল, চেহারাটা একেবারে হুবহু পাতুর; এমন কি, বাঁ কপালের আবটা পর্য্যন্ত। তবে কি না—

মোক্তার তেরিয়া হয়ে উঠে বললে,—তবে কিনা আবার কিসের।

ওরা বললে,—সেই রকমের পাতুই বটে কিন্তু সেই পাতুই, হলপ ক'রে
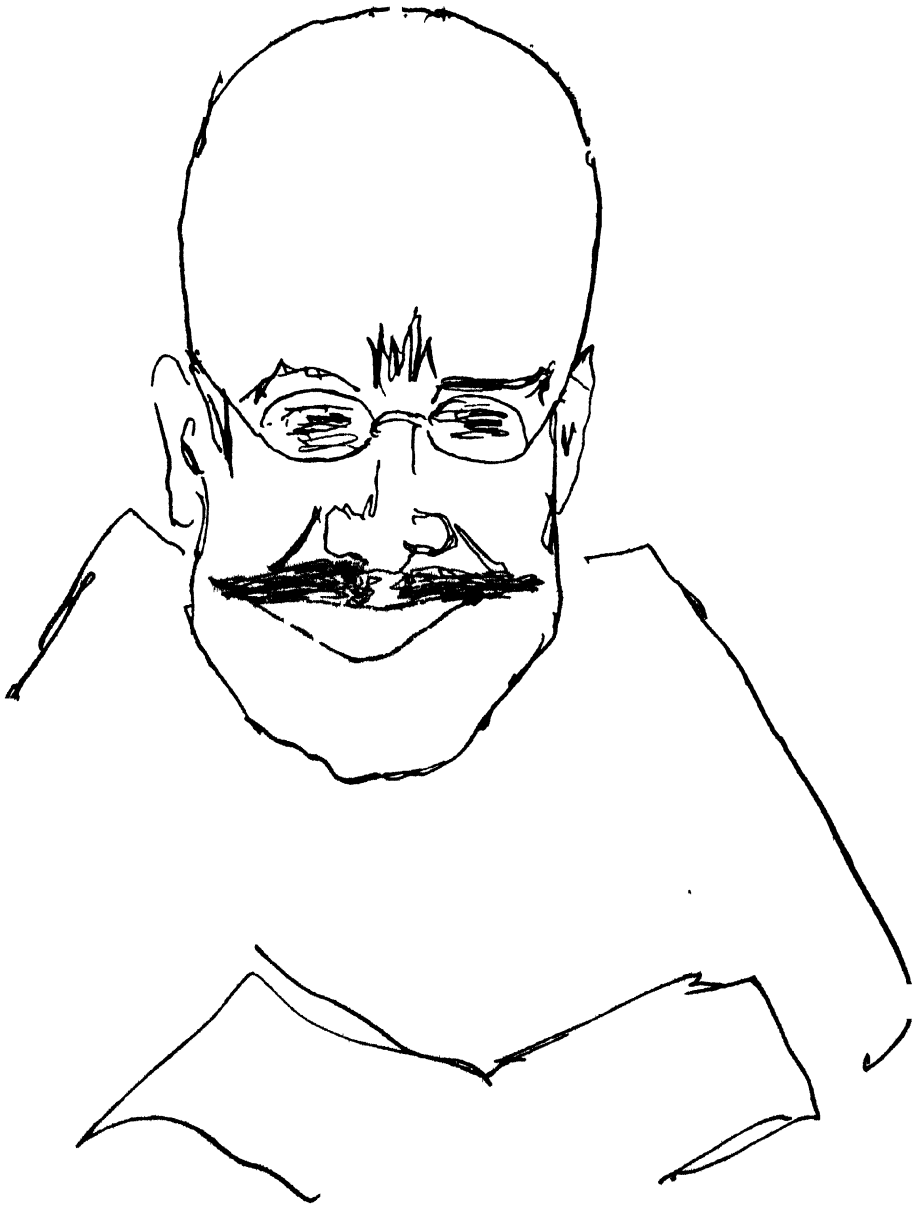
এমন কথা বলি কী ক'রে। ঠাক্রুণকে তো জানি, বন্ধু কম দুঃখ পায়নি, অনেক ঝাঁটা ক্ষয়ে গেছে ওর পিঠে। তার দাম বাঁচালে গাঁজার খরচে টানাটানি পড়ত না। তাই বলছি হুজুর, আদালতে হলপ ক'রে ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করতে পারব না।

মোক্তার চোখ রাঙিয়ে বললে, তাহোলে এ লোকটা কে বলো। দ্বিতীয় পাতু বানাবার শক্তি ভগবানেরও নেই।

গেঁজেলের সর্দ্দার বললে, ঠিক বলেছ বাবা, এরকম ছিষ্টি দৈবাৎ হয়। ভগবান নাকে খৎ দিয়েছেন এমন কাজ আর করবেন না। তবু তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি যে একটা কোনো সয়তান ভগবানের পাল্টা জবাব দিয়েছে। একেবারে ওস্তাদের হাতের নকল, পাকা জালিয়াতের কাজ। পাতুর দেহ-খানা শুকিয়ে শুকিয়ে ওর নাক চিম্‌সিয়ে বেঁকে গিয়েছিল, সেই বঙ্কিমচন্দুরে নাকটি পর্য্যন্ত যেন কেটে ওর মুখের মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছে। ওর হাতের চামড়া নকল করতে বোধ করি হাজার চামচিকের ডানা খরচ করতে হয়েছে।

তুমি দেখলে মকদ্দমা আর টেঁকে না, সাহেবকে বললে, এক হপ্তা সময় দিন, খাঁটি পাতুপক্ষীরাজকে হাজির ক'রে দেব এই আদালতে। তখনি ছুটলে তেলেনিপাড়ার দিঘির ঘাটে। কপাল ভালো, ঠিক তক্ষুনি তোমার দেহটা উঠছে ভেসে। পাতুর দেহ ডাঙায় চিৎ ক'রে ফেলে পুরোনো খোলটা জুড়ে বসলে। মস্ত একটা হাঁপ ছেড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলে —ওরে পাতু।

তখনি ওর দেহটা উঠল খাড়া হয়ে। পাতু বললে, ভায়া সঙ্গে সঙ্গেই ছিলুম। মনটা অস্থির ছিল গাঁজার মৌতাতে। ইচ্ছে করত আত্মহত্যে করি, কিন্তু সে রাস্তাও তুমি জুড়ে বসেছিলে। বেঁচে যখন ছিলুম তখন বেঁচে থাকবার সখ ছিল ষোলো আনা, যেমনি মরেছি অমনি আর যে কোনো মতেই

কোনো কালেই মরতে পারব না এই দুঃখ অসহ্য হয়ে উঠল। সামান্য একটা দড়ি নিয়ে গলায় ফাঁস লাগাব এটুকু যোগ্যতাও রইল না।

তুমি বললে, যা হবার তা তো হোলো, এখন চলো আদালতে। জজ সাহেবকে ব'লে তোমার গাঁজার বরাদ্দ করে দেব।

গেলে আদালতে। জজ সাহেব পাতুকে ধমক দিয়ে বললে, এ বুড়ি তোমার স্ত্রী কি না সত্যি ক'রে বলো।

পাতু বললে, হজুর, সত্যি ক'রে বলতে মন যায় না। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে মিথ্যে ব'লে পাপ করব কেন। নিশ্চয় জানি যে, পাপের সঙ্গে সঙ্গে উনিই পিছন পিছন ছুটবেন। উনিই আমার প্রথম পক্ষের পরিবার।

সাহেব জিগেস করলেন, আরো আছে না কি।

পাতু বললে, না থাকলে মান রক্ষা হয় না যে, কুলীনের ছেলে। নৈকষ্য-কুলীন।

* * * * *

রবিবার দিনে পুপুদিদি পড়েছে গল্পটা। আমাকে জিগেস করলে— আচ্ছা দাদামশায়, তুমি যে লিখেছ এক রাশ ইংরেজি বই নিয়ে কোন্ কলেজের জন্যে বই লিখছ। তোমার আবার কলেজ কোথায়, তা ছাড়া কখনো তো দেখিনি ঐ রকমের বই খুলতে। তুমি তো লেখো কেবল ছড়া।

স্পষ্ট জবাব না দিয়ে একটুখানি হাসলুম।

আচ্ছা দাদামশায়; তুমি কি সংস্কৃত জানো।

দেখো পুপুদিদি এরকম প্রশ্নগুলো বড়ো রূঢ়। মুখের সামনে জিগেস করতে নেই।

৯

সকালবেলায় পুপেদিদি উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলে, দাদামশায়, সে-কে নিয়ে সব গল্প কি ফুরিয়ে গেল।

দাদামশায় খবরের কাগজ ফেলে রেখে চষমা কপালে তুলে বললে, গল্প ফুরোয় না, গল্প-বলিয়ের দিন ফুরোয়।

আচ্ছা ও তো গা ফিরিয়ে পেলে তারপরে কী হোলো বলো না।

আবার ওকে গা খাটিয়ে মরতে হবে, গায়ে প'ড়ে নিতে হবে নানা দায়। কখনো গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে, কখনো গালমন্দ গা পেতে নেবে, কখনো নেবে না, কখনো কাজে গা লাগবে কখনো লাগবে না। ওর গা থাকা সত্ত্বেও কুঁড়েমি দেখে লোকে বলবে কিছুতে ওর গা নেই। কখনো গা ঘুরবে, কখনো গা কেমন করবে, গা ঘুলিয়ে যাবে, কখনো গা ভার হবে, কখনো গা মাটি-মাটি করবে, গা ম্যাজম্যাজ করবে, গা সির্‌সির্‌ করবে, গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করতে থাকবে। সংসারটা কখনো হবে গা-সওয়া কখনো হবে উল্টো, কারো কথায় গা জ্ব'লে যাবে কারো কথায় গা যাবে জুড়িয়ে। বন্ধু বান্ধবের কথা শুনে গায়ে জ্বর আসবে। এত মুস্কিল একখানা গা নিয়ে।

আচ্ছা দাদামশায়, ও যখন আর-একজনের গা নিয়ে বেড়াত তখন মুস্কিল হোত কার। গা-কেমন করলে ওর করত, কি তার করত।

শক্ত কথা। আমি তো বলতে পারব না, ওকে জিগেস করলে ওরও মাথা ঘুরে যাবে।

দাদামশায়, গা নিয়ে এত হাঙ্গাম আমি কখনো ভাবিনি।

ঐ হাঙ্গামগুলো জোড়া দিয়েই তো যত গল্প। গায়ের উপর সওয়ার হয়ে গল্প ছুটেছে চারদিকে। কোনো গা গল্পের গাধা, কোনো গা গল্পের রাজহস্তী।

তোমার গা কী দাদামশায়।

বলব না। অহঙ্কার করতে বারণ করে শাস্ত্রে।

দাদামশায়, সে-র গল্প তুমি থামিয়ে দিলে কেন।

বলি তাহোলে। কুঁড়েমির স্বর্গ সকল স্বর্গের উপরে। সেখানে যে ইন্দ্র ব'সে অমৃত খাচ্চেন হাজারচক্ষু আধখানা বুজে, তিনি হোলেন গল্পের দেবতা। আমি তাঁর ভক্ত; কিন্তু তাঁর সভায় আজকাল ঢুকতেই পারিনে। আমার ভাগে গল্পের প্রসাদ অনেকদিন থেকে বন্ধ।

কেন।

পথ ভুল হয়ে গিয়েছিল।

কী করে।

অমরাবতীর যে সুরধুনী নদীর একপারে ইন্দ্রলোক, তারি ভাঁটিতে আছে আরেক স্বর্গ। কার্‌খানাঘরের কালো ধোঁয়ার পতাকা উড়ছে সেখানকার আকাশে। সেটা হোলো কাজের স্বর্গ। সেখানে হাফ্‌পেণ্ট্‌পরা দেবতা বিশ্বকর্ম্মা। একদিন শরৎকালের সকালে পুজোর থালায় শিউলি ফুল সাজিয়ে রাস্তায় চলেছি; ঘাড়ের উপর এসে পড়ল বাইক-চড়া এক পাণ্ডা। তার ঝুলিতে একতাড়া খাতা, বুকের পকেটে একটা লাল কালীর, একটা কালো কালীর ফাউণ্টেনপেন, খবরের কাগজের কাটা টুকরোর বাণ্ডিল চায়না-কোটের দুই পকেট ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছে, ডানহাতের কব্‌জি ঘড়িতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্‌, বাঁ হাতে কলকাতা টাইম, ব্যাগে ই আই আর, ই, বি, আর, এ, বি, আর, এন, ডব্লু, আর, বি, এন, আর, বি, বি, আর, এস, আই, আর-এর টাইম-টেবিল। বুকের পকেটে নোটবই ডায়রি সুদ্ধ। ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়িয়ে পড়ি আর কী। সে বললে, আকাশের দিকে তাকিয়ে চলেছ কোন চুলোয়।

আমি বললুম, রাগ কোরো না পাণ্ডাজি। মন্দিরে পুজো দিতে যাব, রাস্তা খুঁজে পাচ্চিনে।

সে বললে, তোমরা বুঝি মেঘের দিকে হাঁ-ক'রে-তাকানো রাস্তা-খোঁজার দল। চলো পথ দেখিয়ে দিচ্চি।

আমাকে হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে নিয়ে এল বিশকর্ম্মা ঠাকুরের মন্দিরে। হাঁ না করবার সময় দিলে না। কিছু জিগেস করবার আগেই বললে, রাখো এইখানে থালা, পকেট থেকে বের করো পাঁচসিকে দক্ষিণে।

বোকার মতো পুজো দিলেম। তখনি হিসেব সে টুঁকে নিলে তার নোট বইয়ে। কব্জিঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, হয়েছে কাজ, এখন বেরোও। সময় নেই।

পরদিন থেকেই দেখি ফল ফলেছে। ভোর তখন সাড়ে চারটে। ডাকাত পড়েছে ভেবে ধড়ফড় ক'রে ঘুম ভেঙে শুনি, অনাথ-তারিণী সভার সভ্যেরা বারো তেরো বছরের পঁচিশটা ছেলে জুটিয়ে দরজায় এসে চীৎকারস্বরে গান জুড়ে দিয়েছে,—

যত পেটে ধরে, তার চেয়ে ভরো পেটে,
টাকাপয়সায় পকেট পড়ছে ফেটে,
হিসেব খতিয়ে দেখলে বুঝতে পারো,
অনাথজনের কত ধার তুমি ধারো।
তারো, গরীবেরে তারো,
তারো, তারো, তারো।

তারো তারো—করতে করতে ভীষণ চাঁটি পড়তে লাগল খোলে। মনে মনে যত খতিয়ে দেখছি তহবিলে কত টাকা বাকি, চাঁটি ততই কানে তালা ধরিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে বাজল কাঁসর, তারো তারো তারো-ক'রে নাচ জুড়ে দিলে ছেলেগুলো। অসহ্য হয়ে এল। দেরাজ খুলে থলিটা বের করলেম। সাতদিনের না-কামানো দাড়িওয়ালা ওদের সর্দ্দার উৎসাহিত হয়ে

চাদর পেতে ধরলে। থলি ঝাড়তে বেরোল একটাকা ন আনা তিন পয়সা। মাসের দুদিন বাকি, দরজির দেনার জন্যে টানাটানি করে ঐটুকু রেখেছিলেম।

গান ছেড়ে গাল সুরু করলে। বললে, অগাধ টাকা, চিরটা দিন পায়ের উপর পা দিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে আছ, ভুলেছ যেদিন মরবে, সেদিন তোমার মতো লক্ষপতির যে দর আর আমাদের ছেঁড়া ট্যানাপরা ভিখিরিরও সেই দর।

এ কথাগুলো পুরোনো ঠেকল, কিন্তু ঐ লক্ষপতি বিশেষণটাতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

এই হোলো সুরু। তারপরে ইতিমধ্যে পঁচিশটা সভার সভ্য হয়েছি। বাংলাদেশে সরকারী সভাপতি হয়ে দাঁড়ালেম। আদি ভারতীয় সঙ্গীতসভা, কচুরিপানাধ্বংসন সভা, মৃত-সৎকার সভা, সাহিত্যশোধন সভা, তিন চণ্ডীদাসের সমন্বয় সভা, ইক্ষু-ছিবড়ের পণ্যপরিণতি সভা, খন্যানে খনার লুপ্তভিটা সংস্কার সভা, পিঁজরাপোলের উন্নতি-সাধিনী সভা, ক্ষৌরব্যয়নিবারিণী-দাড়ি-গোঁফ-রক্ষণী সভা—ইত্যাদি সভার বিশিষ্ট সভ্য হয়েছি। অনুরোধ আসছে, ধনুষ্টঙ্কার-তত্ত্ব বইখানির ভূমিকা লিখতে, নব্যগণিত পাঠের অভিমত দিতে, ভুবনডাঙায় ভবভূতির জন্মস্থান নির্ণয় পুস্তিকার গ্রন্থকারকে আশীর্ব্বাদ পাঠাতে, রাওলপিণ্ডির ফরেষ্ট অফিসারের কন্যার নামকরণ করতে, দাড়িকামানো সাবানের প্রশংসা জানাতে, পাগলামির ওষুধ সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা প্রচার করতে।

দাদামশায়, মিছিমিছি তুমি এত বেশি বকো যে তোমার সময় নেই বললে কেউ বিশ্বাস করে না। আজ তোমাকে বলতেই হবে গা ফিরে পেয়ে কী করলে সে।

বিষম খুসি হয়ে চলে গেল দমদমে।

দমদমে কেন।

অনেকদিন পরে নিজের কান দুটো ফিরে পেয়ে স্বকর্ণে আওয়াজ শোন-

বার সখ ওর কিছুতে মিটতে চায় না। শ্যামবাজারের মোড়ে কান পেতে থাকে ট্র্যামের বাসের ঘড়ঘড়ানিতে, টিটেগড়ের চটকলের দারোয়ানের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছে তার ঘরে বসে কলের গর্জ্জন শুনে ওর চোখ বুজে আসে। ঠোঙায় করে রসগোল্লা আর আলুর দম নিয়ে বার্ণ কোম্পানির কামারের দোকানে বসে খেতে যায়। বন্দুকের তাক অভ্যেস করতে গোরা ফৌজ গেছে দমদমে, ও তারি ধুম্ ধুম শব্দ শুনছিল আরামে, টার্গেটের ওপারে ব'সে। আনন্দে আর থাকতে পারলে না, টার্গেটের এধারে মুখ বাড়িয়ে দেখতে এসেছে, লাগল একটা গুলি ওর মাথায়। —বাস্।

বাস্ কী দাদামশায়।

বাস্ মানে সব গল্প গেল একদম্ ফুরিয়ে।

না, না, সে হোতেই পারে না। আমাকে ফাঁকি দিচ্চ। এমন ক'রে তো সব গল্পই ফুরোতে পারে।

ফুরোয় তো বটেই।

না সে হবে না কিছুতেই। তারপরে কী হোলো বলো।

বলো কী—মরার পরেও।

হাঁ মরার পরে।

তুমি গল্পের সাবিত্রী হয়ে উঠলে দেখছি।

না, অমন ক'রে আমাকে ভোলাতে পারবে না, বলো কী হোলো।

আচ্ছা বেশ।—

লোকে বলে মরার বাড়া গাল নেই। মরার বাড়াও গাল আছে সেই কথাটা বলি তবে।—ফৌজের ডাক্তার ছিল তাঁবুতে, মস্ত ডাক্তার সে। সে যখন খবর পেলে মানুষটা মগজে গুলি লেগে মরেছে, বিষম খুসি হয়ে লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—হুর্‌রা।

খুসি হোলো কেন।

ও বললে, এইবার মগজ বদল করার পরীক্ষা হবে।

মগজ বদল হবে কী ক'রে।

বিজ্ঞানের বাহাত্মরি। জু থেকে চেয়ে নিলে একটা বনমানুষ। বের করলে তার মগজ। আর সে-র মাথার খুলি খুলে ফেললে। তার মধ্যে বাঁদরের মগজ পুরে দিয়ে খড়ির পলেস্তারা দিয়ে মাথাটা বেঁধে রাখলে পনেরো দিন। খুলি জুড়ে গেল। বিছানা ছেড়ে সে যখন উঠল, তখন সে এক বিষম কাণ্ড। যাকে দেখে তার দিকে দাঁত খিচিয়ে কীচিমিচি করে ওঠে। নর্স দিলে দৌড়। ডাক্তার সাহেব বজ্রমুঠিতে ওর তুই হাত চেপে ধরে জোর গলায় বললেন, স্থির হয়ে বোসো এইখানে। ও হুঙ্কারটা বুঝলে কিন্তু ভাষাটা বুঝলে না। ও চৌকিতে বসতে চায় না, ও লাফ দিয়ে উঠে বসতে চায় টেবিলের উপরে। কিন্তু লাফ দিতে পারে না, ধপ্ ক'রে পড়ে যায় মেজের উপর। দরজাটা খোলা ছিল, বাইরে ছিল একটা অশথ গাছ। সবার হাত এড়িয়ে ছুটল সেই গাছের দিকে। ভাবলে এক লাফে চড়তে পারবে ডালে। বারবার লাফ দিতে থাকে অথচ ডালে পৌঁছতে পারে না, ধপ্ ক'রে পড়ে যায়। বুঝতেই পারে না কেন পারছে না। রেগে রেগে ওঠে। ওর লম্ফ দেখে চারদিকে মেডিকেল কলেজের ছেলেরা হো হো ক'রে হাসতে থাকে। ও দাঁত খিচিয়ে তেড়ে তেড়ে যায়। একজন ফিরিঙ্গি ছোঁড়া গাছতলায় পা ছড়িয়ে বসে কোলে রুমাল পেতে রুটি মাখন দিয়ে কলা দিয়ে আরামে খাচ্ছিল, ও হঠাৎ গিয়ে তার কলা ছিনিয়ে নিয়ে দিলে মুখে পুরে; ছেলেটা রেগে ওকে মারতে যায়, বন্ধুদের হাসি কিছুতে থামতে চায় না।

মহা ভাবনা পড়ে গেল ওর জিম্মে নেবে কে। কেউ বললে, পাঠাও জু-তে, কেউ বললে, অনাথ-আশ্রমে। জু-র কর্তা বললে এখানে মানুষ পোষা আমাদের বরাদ্দে নেই, অনাথ-আশ্রমের অধ্যক্ষ বললে এখানে বাঁদর পোষা আমাদের নিয়মে কুলোবে না।

দাদামশায়, থামলে কেন।

দিদিমণি, জগতের সব কিছুর সব শেষে আছে থামা।

না, এ কিন্তু এখনো থামেনি। কলা ছিনিয়ে খাওয়া ও-তো যে-সে পারে।

আচ্ছা, কাল হবে, আজ কাজ আছে।

কাল কী হবে বলো না অল্প একটুখানি।

জানো তো ওর বিয়ের সম্বন্ধ আগেই হয়েছে। ওর যে মগজ বদল হয়ে গেছে সে খবরটা কনের বাড়িতে পৌঁছয় নি। দিন স্থির, লগ্ন স্থির। বরের পিসে ওকে মস্ত দু'ছড়া কলা খাইয়ে ঠাণ্ডা করে বিয়ের জায়গায় নিয়ে গেছেন। তার পরে বিয়ে বাড়িতে যে কাণ্ডটা হোলো তা ভালো করে ফলিয়ে বললে তখন তুমিই বলবে গল্পের মতো গল্প হয়েছে। এর পরে আর ওকে মেরে ফেলবার দরকার হবে না। সে মরার বাড় হবে।

*　　*　　*　　*

সন্ধ্যেবেলায় বসেছি ছাদে। দিব্যি দক্ষিণের হাওয়া দিচ্চে। শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। পুপুদিদি একটি আকন্দের মালা গেঁথে এনেছে কাঁচপাত্রে—গল্প বলা শেষ হোলে বকশিষ মিলবে।

হেনকালে হাঁপাতে হাঁপাতে সে উপস্থিত। বললে, আজ থেকে আমার গল্প জোগানের কাজে আমি ইস্তফা দিলুম। আমাকে পাতু গেঁজেলের গা পরিয়েছিলে, সেও সহ্য করেছি, শেষকালে বাঁদরের মগজ পুরেছ আমার খুলির মধ্যে, এ সইবে না। এর পরে হয়তো আমাকে চামচিকে কি টিকটিকি কি গুব্‌রে পোকা বানিয়ে দেবে। তোমাদের অসাধ্য কিছুই নেই। আজ আপিসে গিয়ে কেদারা টেনে বসেছি দেখি ডেস্কের উপরে এক ছড়া মর্ত্তমান কলা। সহজ অবস্থায় কলা আমি ভালোই বাসি—কিন্তু এখন থেকে আমাকে কলা খাওয়া ছেড়েই দিতে হবে। পুপুদিদি, এর পরে তোমার ঐ দাদামশায়

আমাকে নিয়ে যদি ব্রহ্মদত্যি কিম্বা কন্ধকাটা বানান, তা হোলে কাগজে না ছাপান যেন। ইতিমধ্যে কন্যাকর্ত্তা এসেছিলেন আমার ঘরে। বিয়েতে আশি ভরি সোনা দেবার কথা পাকা ছিল,—একদম নেমে গেছে তেরো ভরিতে, ওরা বুঝেছে আমার ভাগ্যে এর পরে কনে জোটা দায় হবে। এই তবে বিদায় নিলেম।

১০

সন্ধেবেলায় বসে আছি দক্ষিণদিকের চাতালে। সামনে কতকগুলো পুরোনো কালের প্রবীণ শিরীষ গাছ আকাশের তারা আড়াল ক'রে জোনাকির আলো দিয়ে যেন একশোটা চোখ টিপে ইসারা করছে।

পুপেদিকে বললেম, বুদ্ধি তোমার অত্যন্ত পেকে উঠছে তাই মনে করছি আজ তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেব একদিন তুমি ছেলেমানুষ ছিলে।

দিদি হেসে উঠে বললে, ঐখানে তোমার জিৎ। তুমিও এককালে ছেলেমানুষ ছিলে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার উপায় আমার হাতে নেই।

আমি নিঃশ্বাস ফেলে বললুম, বোধ হয় আজকের দিনে কারো হাতেই নেই। আমিও শিশু ছিলুম তার একমাত্র সাক্ষী আছে ঐ আকাশের তারা। আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি তোমার একদিনকার ছেলেমানুষির কথা বলব। তোমার ভালো লাগবে কি না জানিনে, আমার মিষ্টি লাগবে।

আচ্ছা ব'লে যাও।

বোধ হচ্চে ফাল্গুন মাস পড়েছে। তার আগেই ক'দিন ধরে রামায়ণের গল্প শুনেছিলে সেই চিক্‌চিকে টাকওয়ালা কিশোরী চট্টর কাছে। আমি সকাল বেলায় চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছি তুমি এতখানি চোখ ক'রে এসে উপস্থিত। আমি বললেম, হয়েছে কী।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, আমাকে হরণ ক'রে নিয়েছে।

কী সর্ব্বনাশ। কে এমন কাজ করলে।

এ প্রশ্নর উত্তরটা তখনো তোমার মাথায় তৈরি হয়নি। বলতে পারতে রাবণ, কিন্তু কথাটা সত্য হোত না ব'লে তোমার সঙ্কোচ ছিল। কেননা আগের সন্ধেবেলাতেই রাবণ যুদ্ধে মারা গিয়েছে, তার একটা মুণ্ডুও বাকি ছিল না। উপায় না দেখে একটু থম্‌কে গিয়ে তুমি বললে, সে আমাকে বলতে বারণ করেছে।

তবেই তো বিপদ বাধালে। তোমাকে এখন উদ্ধার করা যায় কী ক'রে।

কোন্ দিক দিয়ে নিয়ে গেল।

সে একটা নতুন দেশ।

খান্দেশ নয় তো।

না।

বুন্দেলখণ্ড নয়।

না।

কী রকমের দেশ।

নদী আছে, পাহাড় আছে, বড়ো বড়ো গাছ আছে। খানিকটা আলো খানিকটা অন্ধকার।

সে তো অনেক দেশেই আছে। রাক্ষস গোছের কিছু দেখ্‌তে পেয়েছিলে। জিব-বের-করা কাঁটাওয়ালা।

হাঁ হাঁ, সে একবার জিব মেলেই কোথায় মিলিয়ে গেল।

বড়ো তো ফাঁকি দিলে, নইলে ধরতুম তার ঝুঁটি। যাই হোক্ একটা কিছুতে করে তো তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল। রথে।

না।

ঘোড়ায়।

না।

হাতীতে।

ফস্ ক'রে ব'লে ফেললে—খরগোষে। ঐ জন্তুটার কথা খুব মনে জাগছে—জন্মদিনে পেয়েছিলে একজোড়া, বাবার কাছ থেকে।

আমি বললেম, তবেই তো চোর কে তা জানা গেল।

টিপিটিপি হেসে তুমি বললে, কে বলো তো।

এ নিঃসন্দেহ চাঁদামামার কাজ।

কী ক'রে জানলে।

তারও যে অনেক কালের বাতিক খরগোষ পোষা।

কোথায় পেয়েছিল খরগোষ।

তোমার বাবা দেয়নি।

তবে কে দিয়েছিল।

ও চুরি করেছিল ব্রহ্মার চিড়িয়াখানায় ঢুকে।

ছিঃ।

ছিঃই তো। তাই ওর গায়ে কলঙ্ক লেগেছে, দাগা দিয়েছেন ব্রহ্মা।

বেশ হয়েছে।

কিন্তু শিক্ষা হোলো কই। আবার তো তোমাকে চুরি করলে। বোধ হয় তোমার হাত দিয়ে ওর খরগোষকে ফুলকপির পাতা খাওয়াবে।

খুসি হোলে শুনে। আমার বুদ্ধির পরখ করবার জন্মে বললে, আচ্ছা বলো দেখি, খরগোষ কী ক'রে আমাকে পিঠে ক'রে নিলে।

নিশ্চয় তুমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

ঘুমলে কি মানুষ হাল্কা হয়ে যায়।

হয় বৈকি। তুমি ঘুমিয়ে কখনো ওড়োনি।

হাঁ উড়েছি তো।

তবে আর শক্তটা কী। খরগোষ তো সহজ, ইচ্ছে করলে কোলা ব্যাঙের পিঠে চড়িয়ে তোমাকে মাঠময় ব্যাং-দৌড় করিয়ে বেড়াতে পারত।

ব্যাং! ছী ছি ছি। শুনলেও গা কেমন করে।

না, ভয় নেই—ব্যাঙের উৎপাত নেই চাঁদের দেশে।

একটা কথা জিগেস করি, পথের ব্যাঙ্গমা দাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি কি।

হাঁ, হয়েছিল বই কি।

কী রকম।

ঝাউগাছের উপর থেকে নিচে এসে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। বললে, পুপে দিদিকে কে চুরি করে নিয়ে যায়। শুনে খরগোষ এমন দৌড় দৌড়ল যে ব্যাঙ্গমা দাদা পারল না তাকে ধরতে।

আচ্ছা তারপরে।

কার পরে।

খরগোষ তো নিয়ে গেল, তারপরে কী হোলো বলো না।

আমি কী বলব। তোমাকেই তো বলতে হবে।

বাঃ আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কেমন করে জানব।

সেই তো মুস্কিল হয়েছে। ঠিকানাই পাচ্চিনে কোথায় তোমাকে নিয়ে গেল। উদ্ধার করতে যাই কোন্ রাস্তায়। একটা কথা জিগেস করি, যখন রাস্তা দিয়ে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছিল ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছিলে কি।

হাঁ হাঁ, পাচ্ছিলুম, ঢং ঢং ঢং।

তাহোলে রাস্তাটা সোজা গেছে ঘণ্টাকর্ণদের পাড়া দিয়ে।

ঘণ্টাকর্ণ। তারা কী রকম।

তাদের তুটো কান তুটো ঘণ্টা। আর তুটো ল্যাজে তুটো হাতুড়ি। ল্যাজের ঝাপটা দিয়ে একবার এ কানে বাজায় ঢং, একবার ও কানে বাজায় ঢং। তুজাতের ঘণ্টাকর্ণ আছে, একটা আছে হিংস্র, কাঁসরের মতো খন্‌খন্ আওয়াজ দেয়, আর একটার গম্‌গম্ গম্ভীর শব্দ।

তুমি কখনো তার শব্দ শুনতে পাও, দাদামশায়।

পাই বই কি। এই কাল রাত্তিরেই বই পড়তে পড়তে হঠাৎ শুনলেম

—ឃុះ ២៩
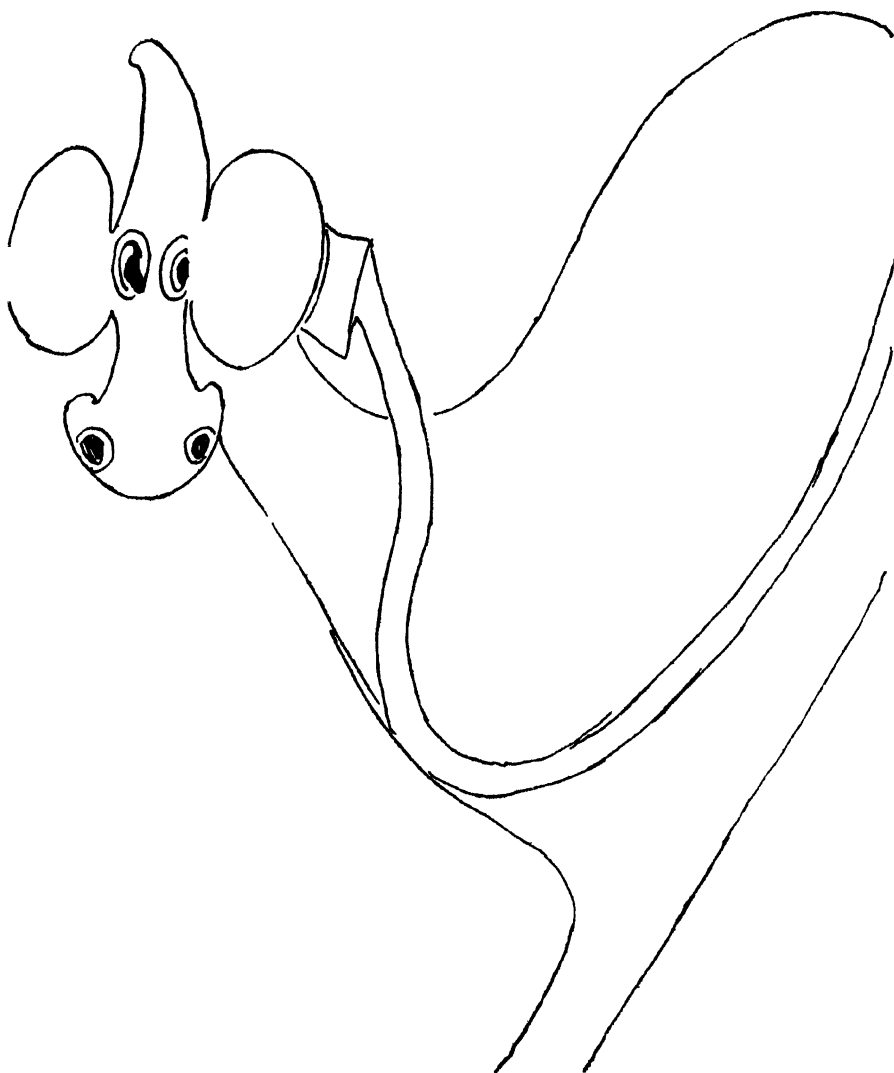
ঘণ্টাকর্ণ চলেছেন ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে। বারোটা বাজালেন যখন, তখন আর থাকতে পারলুম না। তাড়াতাড়ি বই ফেলে দিয়ে চমকে উঠে দৌড় দিলুম বিছানায়, বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে চোখ বুজে রইলুম পড়ে।

খরগোষের সঙ্গে ঘণ্টাকর্ণের ভাব আছে।

খুব ভাব। খরগোষটা তারই আওয়াজের দিকে কান পেতে চলতে থাকে সপ্তর্ষিপাড়ার ছায়াপথ দিয়ে।

তার পরে।

তার পরে যখন একটা বাজে, দুটো বাজে, তিনটে বাজে, চারটে বাজে, পাঁচটা বাজে তখন রাস্তা শেষ হয়ে যায়।

তারপরে।

তারপরে পৌঁছয় তন্দ্রা-তেপান্তরের ওপারে আলোর দেশে। আর দেখা যায় না।

আমি কি পৌঁচেছি সেই দেশে।

নিশ্চয় পৌঁচেছ।

এখন তাহোলে আমি খরগোষের পিঠে নেই।

থাকলে যে তার পিঠ ভেঙে যেত।

ওঃ, ভুলে গেছি, এখন যে আমি ভারি হয়েছি। তার পরে।

তারপরে তোমাকে উদ্ধার করা চাই তো।

নিশ্চয় চাই। কেমন ক'রে করবে।

সেই কথাটাই তো ভাবছি। রাজপুত্তুরের শরণ নিতে হোলো দেখছি।

কোথায় পাবে।

ঐ যে তোমাদের সুকুমার।

শুনে এক মুহূর্তে তোমার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। একটু কঠিন সুরেই

—ศุ: ๒๑

বললে, তুমি তাকে খুব ভালোবাসো। তোমার কাছে সে পড়া ব'লে নিতে আসে। তাই তো সে আমাকে অঙ্কে এগিয়ে যায়।

[এগিয়ে যাবার অন্য স্বাভাবিক কারণও আছে। সে কথাটার আলোচনা করলুম না।] বললুম, তা তাকে ভালোবাসি আর না বাসি সেই আছে এক রাজপুত্তুর।

কেমন ক'রে জানলে।

আমার সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে তবে সে ঐ পদটা পাকা ক'রে নিয়েছে।

তুমি বেশ একটু ভুরু কুঁচকে বললে, তোমারি সঙ্গে ওর যত বোঝাপড়া।

কী করি বলো, কোনোমতে ও মানতে চায় না ওর চেয়ে আমি বয়সে খুব বেশি বড়ো।

ওকে তুমি বলো রাজপুত্তুর। ওকে আমি জটায়ুপাখী ব'লেও মনে করিনে। ভারি তো।

একটু শান্ত হও। এখন ঘোর বিপদে পড়া গেছে; তুমি কোথায় তার তো ঠিকানাই নেই। তা এবারকার মতো কাজ উদ্ধার ক'রে দিক্,—আমরা নিশ্বেস ফেলে বাঁচি। এর পরে ওকে সেতুবন্ধনের কাঠবিড়ালি বানিয়ে দেব।

উদ্ধার করতে ও রাজি হবে কেন। ওর এক্‌জামিনের পড়া আছে।

রাজি হবার বারো আনা আশা আছে। এই পর্শু শনিবারে ওদের ওখানে গিয়েছিলুম। বেলা তিনটে। সেই রোদ্দুরে মাকে ফাঁকি দিয়ে ও দেখি ঘুরে বেড়াচ্চে বাড়ির ছাদে। আমি বললুম, ব্যাপার কী।

ঝাঁকানি দিয়ে মাথাটা উপরে তুলে বললে, আমি রাজপুত্তুর।

তলোয়ার কোথায়।

দেয়ালির রাত্রে ওদের ছাদে আধপোড়া তুবড়িবাজির একটা কাঠি পড়েছিল। কোমরে সেইটেকে ফিতে দিয়ে বেঁধেছে—আমাকে দেখিয়ে দিলে।
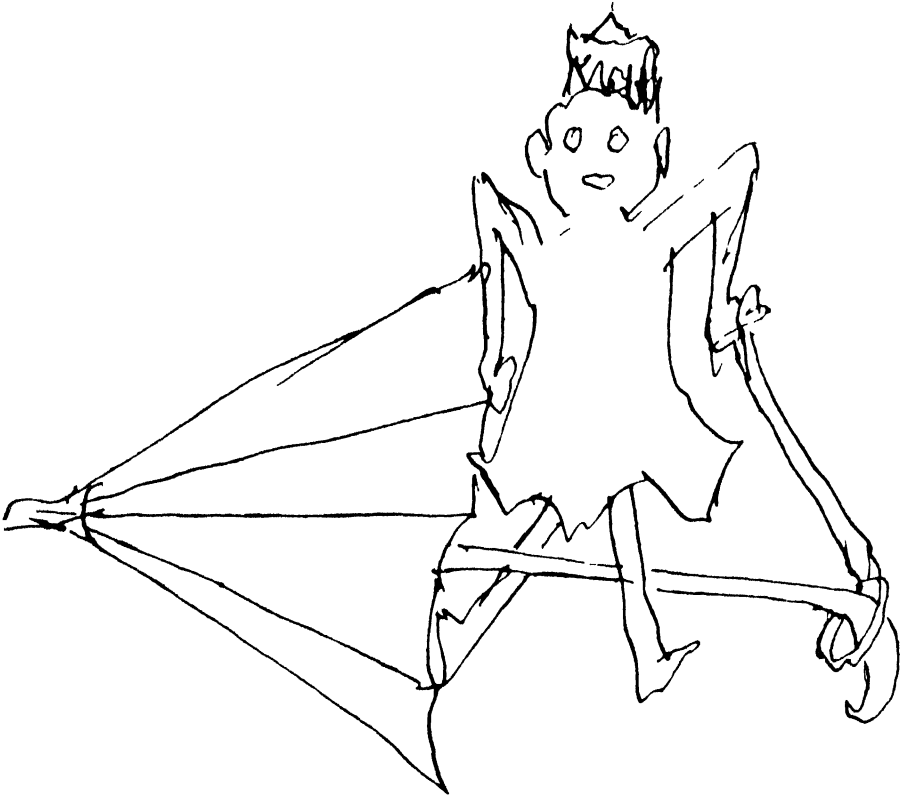
আমি বললুম, তলোয়ার বটে। কিন্তু ঘোড়া চাই তো।

বললে, আস্তাবলে আছে।

ব'লে ছাদের কোণ থেকে ওর জ্যাঠামশায়ের বহুকেলে বেহায়া একটা ছেঁড়া ছাতা টেনে নিয়ে এল। দুই পায়ের মধ্যে তাকে চেপে ধরে হ্যাট্‌হ্যাট্‌ আওয়াজ করতে করতে ছাদময় একবার দৌড় করিয়ে আনলে। আমি বললুম, ঘোড়া বটে।

এর পক্ষিরাজের চেহারা দেখতে চাও।

চাই বই কী।

ছাতাটা ফস ক'রে খুলে দিলে। ছাতার পেটের মধ্যে ঘোড়ার খাবার দানা ছিল সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল ছাদে।

আমি বললুম, আশ্চর্য্য। কী আশ্চর্য্য। এ জন্মে পক্ষীরাজ দেখব কোনোদিন এমন আশাই করিনি।

এইবার আমি উড়ছি দাদা। চোখ বুজে থাকো তাহোলে বুঝতে পারবে আমি ঐ মেঘের কাছে গিয়ে ঠেকেছি। একেবারে অন্ধকার।

চোখ বোজবার দবকার করে না আমার। স্পষ্টই জানতে পারছি তুমি খুব উড়ছ, পক্ষীরাজেব ডানা মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

আচ্ছা, দাদামশায়, আমার ঘোড়াটার একটা নাম দিয়ে দাও তো।

আমি বললুম, ছত্রপতি।

নামটা পছন্দ হোলো। রাজপুত্তুর ছাতার পিঠ চাপড়িয়ে বললে, ছত্রপতি। নিজেই ঘোড়ার হয়ে তার জবাব দিলে, আজ্ঞে।

আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি ভাবছ আমি বললুম; আজ্ঞে, তা নয়, ঘোড়া বললে।

সে কথাও কি আমাকে বলতে হবে। আমি কি এত কালা।

রাজপুত্তুর বললে, ছত্রপতি, আর ভালো লাগছে না, চুপচাপ পড়ে থাকতে।

তারি মুখ থেকে উত্তর পাওয়া গেল, কী হুকুম বলো।

তেপান্তরের মাঠ পেরোনো চাই।

রাজি আছি।

আমি তো আর থাকতে পারিনে, কাজ আছে—রসে ভঙ্গ দিয়ে বল্‌তে

হোলো, রাজপুত্তুর, কিন্তু তোমার মাষ্টার যে বসে আছে। দেখে এলুম তার মেজাজটা চটা।

শুনে রাজপুত্রের মনটা ছটফট ক'রে উঠল। ছাতাটাকে থাবড়া মেরে বল্‌লে, এখ্‌খনি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারো না কি।

বেচারা ঘোড়ার হয়ে আমাকেই বলতে হোলো, রাত্তির না হোলে ওতো উড়তে পারে না। দিনের বেলায় ও ন্যাকামি ক'রে ছাতা সাজে—তুমি ঘুমলেই ও ডানা মেল্‌বে। এখনকার মতো পড়তে যাও নইলে বিপদ বাধবে।

সুকুমার মাস্‌টরের কাছে পড়তে গেল। যাবার সময় আমাকে বললে, কিন্তু সব কথা এখনো শেষ হয়নি।

আমি বললুম, কথা কি কখনোই শেষ হোতে পারে। শেষ হোলে মজা কিসের।

পাঁচটার সময় পড়া শেষ হয়ে যাবে, দাদু তখন তুমি এসো।

আমি বললুম, থর্ড্‌নম্বর রীডরের পরে মুখ বদলাবার জন্যে পয়লা নম্বরের গল্প চাই। নিশ্চয় আসব।

১১

মাষ্টরমশায়কে দেখলুম গলির মোড়ে, ট্রামের প্রত্যাশায় দাড়িয়ে আছেন। আমি যখন গেলুম সুকুমারদেব বাড়ির ছাদে, তখন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। সামনের তেতালা বাড়িটাকে পড়্‌তি বেলাকার রোদ্দ‚র আড়াল করেছে। গিয়ে দেখি চিলে কোঠার সামনে সুকুমাব চুপ ক'রে বসে। ছাদের কোণটাতে বিশ্রাম করছে তার ছত্রপতি। পিছনদিকের সিঁড়ি দিয়ে যখন উপরে উঠে এলুম, তখনো আমার পায়ের শব্দ ওর কানে পৌঁছল না। খানিকবাদে ডাক দিলুম, রাজপুত্তর। ওর যেন স্বপ্ন গেল ভেঙে, চমকে উঠল।

জিগেস করলুম, বসে কী ভাবছ ভাই।

ও বললে, শুকসারীর কথা শুনছি।

শুকসারীর দেখা পেলে কোথায়।

ঐ যে দেখা যাচ্চে পাহাড়ের গায়ে বন। ডালে ডালে ফুল ছড়াছড়ি— হল্‌দে, লাল, নীল, যেন সন্ধ্যাবেলাকার মেঘের মতো। তারি ভিতর থেকে শুকসারীর গলা শোনা যাচ্চে।

তাদের দেখতে পাচ্চ তো।

হাঁ পাচ্চি। খানিকটা দেখা যায়, খানিকটা ঢাকা।

তা কী বলছে ওরা।

এইবার মুস্কিলে পড়ল আমাদের রাজপুত্তর। খানিকটা আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললে, তুমিই বলো না, দাদু, ওরা কী বলছে।

ঐ তো পষ্ট শোনা যাচ্চে ওরা তর্ক করছে।

কীসের তর্ক।

শুক বল্‌ছে, আমি এবার উড়ব, সারী বলছে কোথায় উড়বে।—শুক বলছে যেখানে কোথাও ব'লে কিছুই নেই, কেবল ওড়াই আছে। তুমিও চলো আমার সঙ্গে।—সারী বললে আমি ভালোবাসি এই বনকে, এখানে ডালে জড়িয়ে উঠেছে ঝুম্‌কো লতা ; এখানে ফল আছে বটের, এখানে শিমুলের ফুল যখন ফোটে তখন কাকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ভালো লাগে তার মধু খেতে। এখানে রাত্তিরে জোনাকিতে ছেয়ে যায় ঐ কামরাঙার ঝোপ, আর বাদলায় বৃষ্টি যখন ঝরতে থাকে তখন দুলতে থাকে নারকেলের ডাল ঝরঝর শব্দ ক'রে। আর তোমার আকাশে কীই বা আছে।—শুক বললে, আমার আকাশে আছে সকাল, আছে সন্ধ্যে, আছে মাঝরাত্রের তারা, আছে দক্ষিণে হাওয়ার যাওয়া আসা, আর আছে কিছুই না, কিছুই না, কিছুই না।

সুকুমার জিগেস করলে, কিছুই না থাকে কী ক'রে দাদু।

সেই কথাই তো এইমাত্র সারী জিগেস করলে শুককে।

শুক কী বলছে।

শুক বলছে, আকাশের সব চেয়ে অমূল্যধন ঐ কিছুই-না। ঐ কিছুই-না আমাকে ডাক দেয় ভোরের বেলায়। ওরি জন্যে আমার মন কেমন করে যখন বনের মধ্যে বাসা বাঁধি। ঐ কিছুই-না কেবল খেলা করে রঙের খেলা নীল আঙিনায়—মাঘের শেষে আমের বোলের নিমন্ত্রণ চিঠিগুলি ঐ কিছুই-না-র ওড়না বেয়ে হুহু ক'রে উড়ে আসে, মৌমাছিরা খবর পেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

উৎসাহে সুকুমার লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, বললে, আমার পক্ষীরাজকে ঐ কিছুই না-র রাস্তা দিয়েই তো চালাতে হবে।

নিশ্চয়ই। পুপুদিদির হরণব্যাপারটা আগাগোড়াই ঐ কিছুই-না-র তেপান্তরে।

সুকুমার হাত মুঠো ক'রে বললে, সেইখান দিয়েই আমি তাকে ফিরিয়ে আনব, নিশ্চয় আনব।

বুঝতে পারছ তো পুপুদিদি, রাজপুত্তর তৈরিই আছে—তোমাকে উদ্ধার করতে—দেরি হবে না। এতক্ষণে ছাদের উপরে তার ঘোড়াটা একবার পাখা খুলছে আবার বন্ধ করছে।

তুমি খুব ঝাঁজিয়ে উঠে বললে,—দরকার নেই।

বলো কী, এত বড়ো বিপদ থেকে তোমার উদ্ধার হোলো না, আর আমরা নিশ্চিন্ত থাকব।

হয়ে গেছে উদ্ধার।

কখন হোলো।

শুনলে না, একটু আগেই ঘণ্টাকর্ণ এসে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

কখন ঘটল এটা।

ঐ যে ঢং ঢং ক'রে দিলে নটা বাজিয়ে।

কোন্ জাতের ঘণ্টাকর্ণ।

হিংস্রজাতের। এখন ইস্কুলে যাবার সময় এগিয়ে আসছে। বিচ্ছিরি লেগেছে আওয়াজটা।

গল্পটা অকালে গেল ভেঙে। দুস্‌রা রাজপুত্তুর খুঁজে বের করা উচিত ছিল। এ তো অঙ্কের হরণ পূরণ নয়—ও রকম ক্লাস-পেরনো ছেলে তেপান্তর পেরোবার স্পর্দ্ধা করবে এ তুমি কিছুতেই সইতে পারলে না। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম লাখখানেক ঝিঁ ঝিঁ পোকা আমদানি করব, আমাদের পানাপুকুরের ধারের স্যাওড়া বন থেকে। তা'রা চাঁদামামার নিদ-মহলের পশ্চিমদিকের খিড়কির দরজা দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ঢুকে সবাই মিলে তোমার বিছানার চাদরটাতে দিত টান, সুর সুর ক'রে। তার উপরে তোমাকে

নামিয়ে আনত। তাদের ঝিঁঝিঁ ঝিঁঝিঁ শব্দে চাঁদনি-চকে ঝিমিয়ে পড়ত চাঁদের পাহারাওয়ালা। সমস্ত রাস্তায় বায়না দিয়ে রেখেছিলুম জোনাকির আলোধারীর দলকে। বাঁশতলার বাঁকা গলি দিয়ে তোমাকে নিয়ে চলত, খস্‌খস্ শব্দ করত ঝরে-পড়া শুকনো পাতাগুলো। ঝর ঝর করতে থাকত নারকেলের ডাল। গন্ধে-ভুর-ভুর শর্ষে ক্ষেতের আল বেয়ে যখন এসে পড়তে তিরপুর্ণির ঘাটে, তখন ধামাভরা বিন্নিধানের খই নিয়ে ডাক দিতুম গঙ্গামায়ের শুঁড়তোলা মকরকে, তোমাকে চড়িয়ে দিতেম তার পিঠে। ডাইনে বাঁয়ে তার ল্যাজের ঠেলায় জল উঠত কল-কলিয়ে। তিন পহর রাতে শেয়ালগুলো ডাঙায় দাঁড়িয়ে জিগেস করত, ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া। আমি বলতুম, চুপ রও, কুছ নেই হুয়া। এই যাত্রাপথে প্যাঁচা আর বাদুড়ের সঙ্গেও কিছু আপোসে বন্দোবস্তের কথা ছিল। তাদের কাজে লাগাতুম। ভোর সাড়ে চারটের সময় শুকতারা নেমে পড়ত পশ্চিম আকাশে, পূর্ব্ব আকাশে আলোর রেখায় দেখা দিত সকালবেলার তর্জ্জনীতে সোনার আঙটি থেকে ঠিক্‌রে-পড়া সঙ্কেত। সদ্য জেগে-ওঠা কাক তেঁতুলের ডালে বসে অস্থির হয়ে প্রশ্ন করত, কা-কা। আমি যেমনি বলতুম কিচ্ছু না, অমনি দেখতে দেখতে সব যেত মিলিয়ে।—তুমি জেগে উঠতে তোমার বিছানায়।

পুপুদিদি একটুখানি হেসে বললে, এই যে আমার ছেলেমানুষীর কাহিনীটি শোনা গেল—এটি এত ইনিয়ে বিনিয়ে ব'লে তোমার কী আনন্দ হোলো। আমার হিংসুকে স্বভাব ছিল এইটে জানাবার জন্যে তোমার এতই উৎসাহ। আর আমাদের বিলিতি আমড়াগাছের পাকা আমড়াগুলো পেড়ে নিয়ে সুকুমারদাকে লুকিয়ে দিয়ে আসতুম, আমড়া সে ভালোবাসত ব'লে; চুরির অপবাদটা হোত আমার আর ভোগ করত সে—সে কথাটা চেপে

গেছ। সুকুমারদা না হয় অঙ্কই ভালো কষত কিন্তু আমার বেশ মনে আছে একদিন সে 'অবধান' কথাটার মানে ভেবে পাচ্ছিল না, আমি শ্লেটে লিখে আড় ক'রে ধ'রে তাকে দেখিয়ে দিয়েছিলুম, এ কথাগুলো বুঝি তোমার গল্পের মধ্যে পড়ে না।

আমি বললুম, আমার খুসির কারণ এ নয় যে মনের জ্বালায় তুমি সুকুমারদার যৌবরাজ্য মান্‌তে চাওনি। তার উপরে তোমার হিংসের কারণ ছিল আমার উপর তোমার অনুরাগবশত,—আমার আনন্দের স্মৃতি রয়েছে ঐখানেই।

আচ্ছা তোমার অহঙ্কার নিয়ে তুমি থাকো।—একটা কথা তোমাকে জিগেস করি, সেই যে তোমার নামহারা বানানো মানুষটি—যাকে বলতে সে, তার হোলো কী।

আমি বললেম, তার বয়স বেড়ে গেছে।

ভালোই তো।

সে এখন চিন্তা করে, মাথায় তার দুঃসমস্যার ভিমরুলে চাক বেঁধেছে, তর্কে তার সঙ্গে পারবার জো নেই।

দেখছি আমারি প্যার‍্যাল্যাল লাইনেই চলেছে।

তা হোতে পারে, কিন্তু গল্পের এলেকা ছাড়িয়ে গেছে। থেকে থেকে সে হাত মুঠো ক'রে ঝেঁকে ঝেঁকে ব'লে উঠছে, শক্ত হোতে হবে।

বলুক না। শক্ত ছাঁদেই গল্প জমুক না। চুমুক দিয়ে খাওয়া নেই হোলো, চিবিয়ে খাওয়া চলবে তো। হয়তো আমার পছন্দ হবে।

পাছে আক্কেল দাঁতের অভাবে তাকে কায়দা করতে না পারো এই ভয়ে অনেকদিন তাকে চুপ করিয়ে রেখেছি।

ইস্। তোমার ভাবনা দেখে হাসি পায়। তুমি ঠাউরে রেখেছ আমার যথেষ্ট বয়স হয় নি।

সর্ব্বনাশ। এত বড়ো নিন্দে অতি বড়ো শত্রুও করতে পারবে না।

তাহোলে ডাকো না তাকে তোমার আসরে—তার বর্ত্তমান মেজাজটা বুঝে নিই।

তাই সই।

১২

ঝগড়ুকে বললেম, কোথায় আছে সেই বাঁদরটা। যেখানে পাও বোলাও উস্‌কো।

এল সে তার কাঁটাওয়ালা মোটা গোলাপের গুঁড়ির লাঠিখানা ঠক্‌ঠক্‌ করতে করতে। মালকোঁচামারা ধুতি, চাদরখানা জড়ানো কোমরে, হাঁটু পর্য্যন্ত কালো পশমের মোটা মোজা, লাল ডোরাকাটা জামার উপর হাতাহীন বিলিতি ওয়েষ্টকোট সবুজ বনাতের, সাদা রোঁয়াওয়ালা রাশিয়ান টুপি মাথায়, পুরোনো মালের দোকান থেকে কেনা,—বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে ন্যাকড়া জড়ানো, কোনো একটা সদ্য অপঘাতের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। কড়া চামড়ার জুতোর মস্‌মসানি শোনা যায় গলির মোড় থেকে। ঘন ভুরুদুটোর নিচে চোখদুটো যেন মন্ত্রে-থেমে-যাওয়া দুটো বুলেটের মতো।

বললে, হয়েছে কী। শুক্‌নো মটর চিবচ্ছিলুম দাঁত শক্ত করবার জন্যে, ছাড়ল না তোমার ঝগড়ু। বললে, বাবুর চোখ দুটো ভীষণ লাল হয়েছে, বোধ হয় ডাক্তার ডাকতে হবে। শুনেই তাড়াতাড়ি গয়লা বাড়ি থেকে এক ভাঁড় চোনা এনেছি, মোচার খোলায় ক'রে ফোঁটা ফোঁটা ঢালতে থাকো, সাফ হয়ে যাবে চোখ।

আমি বললুম, যতক্ষণ তুমি আছ আমার ত্রিসীমানায়, আমার চোখের লাল কিছুতেই ঘুচবে না। ভোরবেলাতেই তোমাদের পাড়ার যত মাতব্বর আমার দরজায় ধন্না দিয়ে পড়েছে।

—পৃ: ১১১

বিচলিত হবার কী কারণ।

তুমি থাকতে দোসরা কারণের দরকার নেই। খবর পাওয়া গেল তোমার চেলা কংসারি মুন্সী, যার মুখ দেখলে অযাত্রা, তোমার ছাদে বসে একখানা রামশিঙে তুলে ধরে ফুঁক দিচ্চে, আর গাঁজার লোভ দেখিয়ে জড়ো করেছ যত ফাটা-গলার ফৌজ, তারা প্রাণপণে চেঁচানি অভ্যেস করছে। ভদ্রলোকেরা বলছে, হয় তারা ছাড়বে পাড়া, নয় তোমাকে ছাড়াবে।

মহা উৎসাহে লাফ দিয়ে উঠে সে চীৎকারস্বরে বললে, প্রমাণ হয়েছে।

কিসের প্রমাণ।

বেসুরের দুঃসহ জোর একেবাবে ডাইনামাইট। বদসুরের ভিতর থেকে ছাড়া পেয়েছে দুর্জ্জয় বেগ, উড়ে গিয়েছে পাড়ার ঘুম, দৌড় দিয়েছে পাড়ার শান্তি, পালাই পালাই রব উঠেছে চারদিকে। প্রচণ্ড আসুরিক শক্তি। এর ধাক্কা একদিন টের পেয়েছিলেন স্বর্গের ভালো মানুষরা। বসে বসে আধচোখ বুজে অমৃত খাচ্চিলেন। গন্ধর্ব্ব ওস্তাদেরা তম্বুরা ঘাড়ে অতি নিখুঁৎস্বরে তান লাগাচ্ছিলেন পরজবসন্তে, আর নূপুরঝঙ্কারিণী অপ্সরীরা নিপুণতালে তেহাই দিয়ে নৃত্য জমিয়েছিলেন। এদিকে মৃত্যুবরণ নীলঅন্ধকারে তিন যুগ ধ'রে অসুরের দল রসাতল কোঠায় তিমি মাছের লেজের ঝাপটার বে-লয়ে বেসুর সাধনা করছিল। অবশেষে একদিন শনিতে কলিতে মিলে' দিলে সিগ্নাল, এসে পড়ল বেসুর সঙ্গতের কালাপাহাড়ের দল সুরওয়ালাদের শমে-নাড়া-দেওয় ঘাড়ে, হুঙ্কার ক্রেঙ্কার ঝন্‌ঝন্‌কার ধ্রুম্‌কার দুড়ুমকার গড়গড়গড়ৎকার শব্দে। তীব্র বেসুরের তেলেবেগুনি জ্বলনে পিতামহ পিতামহ ডাক ছেড়ে তাঁরা লুকোলেন ব্রহ্মাণীর অন্দরমহলে। তোমাকে বলব কী আর, তোমার তো জানা আছে সকল শাস্ত্রই।

জানা যে নেই আজ তা বোঝা গেল তোমার কথা শুনে।

দাদা, তোমাদের বই-পড়া বিদ্যে, আসল খবর কানে পৌঁছয় না।

—পৃঃ ১১৩

আমি ঘুরে বেড়াই শ্মশানে মশানে, গূঢ়তত্ত্ব পাই সাধকদের কাছ থেকে। আমার উৎকটদন্তী গুরুর মুখকন্দর থেকে বেসুরতত্ত্ব অল্প কিছু জেনেছিলুম তাঁর পায়ে অনেকদিন ভেরেণ্ডার বিরেচক তৈল মর্দ্দন ক'রে।

বেসুর তত্ত্ব আয়ত্ত করতে তোমার বিলম্ব হয়নি সেটা বুঝতে পারছি। অধিকার'ভেদ মানি আমি।

দাদা, ঐ তো আমার গর্ব্বের কথা। পুরুষ হয়ে জন্মালেই পুরুষ হয় না, পরুষতার প্রতিভা থাকা চাই। একদিন আমাব গুরুর অতি অপূর্ব্ব বিশ্রী মুখ থেকে,—

গুরুমুখকে আমরা বলে থাকি শ্রীমুখ—তুমি বললে বিশ্রীমুখ।

গুরুর আদেশ। তিনি বলেন, শ্রীমুখটা নিতান্ত মেয়েলি—বিশ্রীমুখেই পুরুষের গৌরব। ওর জোরটা আকর্ষণের নয়, বিপ্রকর্ষণের। মানো কি না।

মানতে যে-হতভাগ্য বাধ্য হয় সে মানে বই কি।

মধুর রসে তোমার মৌতাত পাকা হয়ে গেছে দাদা, কঠোর সত্য মুখে রোচে না, ভাঙতে হবে তোমাদের দুর্ব্বলতা—মিঠে সুরে যার নাম দিয়েছ সুরুচি, বিশ্রীকে সহ্য করবার শক্তি নেই যার।

দুর্ব্বলতা ভাঙা সবলতা ভাঙার চেয়ে অনেক শক্ত। বিশ্রীতত্ত্বর গুরু-বাক্য শোনাতে চাচ্ছিলে, শুনিয়ে দাও।

একেবারে আদিপর্ব্ব থেকে গুরু আরম্ভ করলেন ব্যাখ্যান। বললেন, মানবসৃষ্টির সুরুতে চতুর্ম্মুখ তাঁর সামনের দিকের দাড়ি-কামানো দুটো মুখ থেকে মিহি সুর বের করলেন। কোমল রেখাব থেকে মধুর ধারার মসৃণ মিড়ের উপর দিয়ে পিছলে গড়িয়ে এল কোমল নিখাদ পর্য্যন্ত। সেই সুকুমার স্বরলহরী প্রত্যূষের অরুণবর্ণ মেঘের থেকে প্রতিফলিত হয়ে অত্যন্ত আরামের দোলা লাগালো অতিশয় মিঠে হাওয়ায়। তারি মৃদু হিল্লোলে দোলায়িত নৃত্যচ্ছন্দে রূপ নিয়ে দেখা দিল নারী। স্বর্গে শাঁখ বাজাতে লাগলেন বরুণ দেবের ঘরণী।

বরুণ দেবের ঘরণী কেন।

তিনি যে জলদেবী। নারী জাতটা বিশুদ্ধ জলীয়, তার কাঠিন্য নেই, চাঞ্চল্য আছে, চঞ্চল করেও। ভূ-ব্যবস্থার গোড়াতেই জলরাশি। সেই জলে পানকৌড়ির পিঠে চ'ড়ে যত সব নারী ভেসে বেড়াতে লাগল সারিগান গাইতে গাইতে।

অতি চমৎকার। কিন্তু তখন পানকৌড়ির সৃষ্টি হয়েছে না কি।

হয়েছে বৈ কি। পাখীদের গলাতেই প্রথম সুর বাঁধা চলছিল। দুর্ব্বলতার সঙ্গেই মাধুর্য্যের অনবচ্ছিন্ন যোগ, এই তত্ত্বটির প্রথম পরীক্ষা হোলো ঐ দুর্ব্বল জীবগুলির ডানায় এবং কণ্ঠে। একটা কথা বলি রাগ করবে না তো।

না রাগতে চেষ্টা করব।

যুগান্তরে পিতামহ যখন মানবসমাজে দুর্ব্বলতাকেই মহিমান্বিত করবার কাজে কবিসৃষ্টি করেছিলেন তখন সেই সৃষ্টির ছাঁচ পেয়েছিলেন এই পাখীর থেকেই। সেদিন একটা সাহিত্যসম্মিলন গোছের ব্যাপার হোলো তাঁর সভামণ্ডপে, সভাপতিরূপে কবিদের আহ্বান ক'রে বলে দিলেন, তোমরা মনে মনে উড়তে থাকো শূন্যে, আর ছন্দে ছন্দে গান করো বিনাকারণে, যা-কিছু কঠিন তা তরল হয়ে যাক্, যা-কিছু বলিষ্ঠ তা এলিয়ে পড়ে যাক্ আর্দ্র হয়ে। কবিসম্রাট, আজ পর্য্যন্ত তুমি তাঁর কথা রক্ষা করে চলেছ।

চলতেই হবে যতদিন না ছাঁচ বদল হয়।

আধুনিক যুগ শুকিয়ে শক্ত হয়ে আসছে, মোমের ছাঁচ আর মিলবেই না। এখন সে দিন নেই যখন নারীদেবতার জলের বাসাটি দোল খেত পদ্মে, যখন মনোহর দুর্ব্বলতায় পৃথিবী ছিল অতলে নিমগ্ন।

সৃষ্টি ঐ মোলায়েমের ছন্দে এসেই থামল না কেন।

গোটা কয়েক যুগ যেতে না যেতেই ধরণীদেবী আর্ত্তবাক্যে আবেদনপত্র

পাঠালেন চতুর্ম্মুখের দরবারে। বললেন, ললনাদের এই লকার-বহুল লালিত্য আর তো সহ্য হয় না। স্বয়ং নারীরাই করুণকল্লোলে ঘোষণা করতে লাগল— ভালো লাগছে না। উৰ্দ্ধলোক থেকে প্রশ্ন এল, কী ভালো লাগছে না। সুকুমারীরা বললে, বলতে পারিনে।—কী চাই।—কী চাই তারও সন্ধান পাচ্চিনে।

ওদের মধ্যে পাড়াকুঁদুলিরও কি অভিব্যক্তি হয়নি—আগাগোড়াই কি সুবচনীর পালা।

কোঁদলের উপযুক্ত উপলক্ষ্যটি না থাকাতেই বাক্যবাণের টঙ্কার নিমগ্ন রইল অতলে, ঝাঁটার কাঠির অঙ্কুর স্থান পেল না অকূলে।

এত বড়ো দুঃখের সংবাদে চতুর্ম্মুখ লজ্জিত হলেন বোধ করি।

লজ্জা ব'লে লজ্জা। চারমুণ্ড হেঁট হয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন রাজহংসের কোটি যোজন-জোড়া ডানাদুটোর পরে, পুরো একটা ব্রহ্মযুগ। এদিকে আদিকালের লোকবিশ্রুত সাধ্বী পরম পানকৌড়িনী— শুভ্রতায় যিনি ব্রহ্মার পরম হংসের সঙ্গে পাল্লা দেবার সাধনায় হাজারবার ক'রে জলে ডুব দিয়ে দিয়ে চঞ্চুঘর্ষণে পালকগুলোকে ডাঁটাসার ক'রে ফেলছিলেন—তিনি পর্য্যন্ত ব'লে উঠলেন, নির্ম্মলতাই যেখানে নিরতিশয়, সেখানে শুচিতার সর্ব্বপ্রধান সুখটাই বাদ পড়ে, যথা, পরকে খোঁটা দেওয়া; শুদ্ধসত্ব হবার মজাটাই থাকে না। প্রার্থনা করলেন, হে দেব মলিনতা চাই, ভূরিপরিমাণে, অনতিবিলম্বে এবং প্রবলবেগে। বিধি তখন অস্থির হয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, ভুল হয়েছে, সংশোধন করতে হবে।—বাসরে কী গলা। মনে হোলো মহাদেবের মহাবৃষভটার ঘাড়ে এসে পড়েছে মহাদেবীর মহাসিংহটা—অতিলৌকিক সিংহনাদে আর বৃষগর্জ্জনে মিলে দ্যুলোকের নীলমণিমণ্ডিত ভিৎটাতে দিলে ফাটল ধরিয়ে। মজার আশায় বিষ্ণুলোক থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন নারদ। তাঁর ঢেঁকির পিঠ থাবড়িয়ে বললেন,

বাবা ঢেঁকি, শুনে রাখো ভাবীলোকের বিশ্ব-বেসুরের আদিমন্ত্র, যথাকালে ঘর ভাঙাবার কাজে লাগবে। ক্ষুব্ধ ব্রহ্মার চার গলার ঐক্যতান আওয়াজের সঙ্গে যোগ দিলে দিঙনাগেরা শুঁড় তুলে, শব্দের ধাক্কায় দিগঙ্গনাদের বেণীবন্ধ খুলে গিয়ে আকাশ আগাগোড়া ঠাসা হয়ে গেল এলোচুলে—বোধ হোলো কালো পালতোলা ব্যোমতরী ছুটল কালপুরুষের শ্মশান ঘাটে।

হাজার হোক্ সৃষ্টিকর্ত্তা পুরুষ তো বটে।

পৌরুষ চাপা রইল না। তাঁর পিছনের দাড়িওয়ালা দুই মুখের চার নাসাফলক উঠল ফুলে, হাঁপিয়ে-ওঠা বিরাট হাপরের মতো। চার নাসারন্ধ্র থেকে এক সঙ্গে ঝড় ছুটল আকাশের চারদিককে তাড়না ক'রে। ব্রহ্মাণ্ডে সেই প্রথম ছাড়া পেল দুর্জ্জয় শক্তিমান বেসুর প্রবাহ—গোঁ গোঁ গাঁ গাঁ হুড়মুড় দুদ্দাড় গড়গড় ঘড়ঘড় ঘড়াঙ্। গন্ধর্ব্বেরা কাঁধে তম্বুরা নিয়ে দলে দলে দৌড় দিল ইন্দ্রলোকের খিড়কির আঙিনায়, যেখানে শচীদেবী স্নানান্তে মন্দার কুঞ্জচ্ছায়ায় পারিজাত কেশরের ধূপধূমে চুল শুকোতে যান। ধরণীদেবী ভয়ে কম্পান্বিতা, ইষ্টমন্ত্র জপতে জপতে ভাবতে লাগলেন ভুল করেছি বা। সেই বেসুরো ঝড়ের উল্টোপাল্টা ধাক্কায় কামানের মুখের তপ্তগোলার মতো ধক্‌ধক্‌শব্দে বেরিয়ে পড়তে লাগল পুরুষ।—কী দাদা, চুপচাপ যে। কথাগুলো মনে লাগছে তো।

লাগছে বই কি। একেবারে দুমদাম শব্দে লাগছে।

সৃষ্টির সর্ব্বপ্রধান পর্ব্বে বেসুরেরই রাজত্ব—একথাটা বুঝতে পেরেছ তো।

বুঝিয়ে দাও না।

তরল জলের কোমল একাধিপত্যকে ঢুঁ মেরে গুঁতো মেরে লাথি মেরে কিল মেরে ঘুষো মেরে ধাক্কা মেরে উঠে পড়তে লাগল ডাঙা, তার পাথুরে নেড়ামুণ্ডুগুলো তুলে। ভূলোকের ইতিহাসে এইটেকেই সব চেয়ে বড়ো পর্ব্ব ব'লে মানো কি না।

মানি বই কি।

এতকাল পরে বিধাতার পৌরুষ প্রকাশ পেল ডাঙায়—পুরুষের স্বাক্ষর পড়ল সৃষ্টির শক্তজমিতে। গোড়াতেই কী বীভৎস পালোয়ানি। কখনো আগুনে পোড়ানো, কখনো বরফে জমানো, কখনো ভূমিকম্পের জবরদস্তির যোগে মাটিকে হাঁ করিয়ে কবিরাজী বড়ির মতো পাহাড়গুলোকে গিলিয়ে খাওয়ানো—এর মধ্যে মেয়েলি কিছু নেই সে কথা মানো কি না।

মানি বই কি।

জলে ওঠে কলধ্বনি, হাওয়ায় বাঁশি বাজে সোঁ সোঁ—কিন্তু বিচলিত ডাঙা যখন ডাক পাড়তে থাকে তখন ভরতের সঙ্গীতশাস্ত্রটাকে পিণ্ডি পাকিয়ে দেয়। তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্চে কথাটা ভালো লাগছে না। কী ভাবছ ব'লেই ফেলো না।

আমি ভাবছি আর্টমাত্রেরই একটা পুরাগত বনেদ আছে যাকে বলে ট্র্যাডিশন। তোমার বেসুর ধ্বনির আর্টকে বনেদি ব'লে প্রমাণ করতে পারো কি।

খুব পারি। তোমাদের সুরের মূল ট্র্যাডিশন মেয়ে-দেবতার বাদ্যযন্ত্রে। যদি বেসুরের উদ্ভব খুঁজতে চাও তবে সোধে চলে যাও পৌরাণিক মেয়েমহল পেরিয়ে পুরুষদেবতা জটাধারীর দরজায়। কৈলাসে বীণাযন্ত্র বে-আইনী, উর্ব্বশী সেখানে নাচের বায়না নেয়নি। যিনি সেখানে ভীষণ বেতালে তাণ্ডব নৃত্য করেন তাঁর নন্দীভৃঙ্গী ফুঁকতে থাকে শিঙে, তিনি বাজান ববম্বম গালবাদ্য, আর কড়াকড় কড়াকড় ডমরু। ধ্বসে পড়তে থাকে কৈলাসের পিণ্ড পিণ্ড পাথর। মহাবেসুরের আদি উৎপত্তিটা স্পষ্ট হয়েছে তো।

হয়েছে।

মনে রেখো সুরের হার বেসুরের জিত এই নিয়েই পালা রচনা হয়েছে পুরাণে দক্ষযজ্ঞের। একদা যজ্ঞসভায় জমা হয়েছিলেন দেবতারা, দুইকানে কুণ্ডল, দুই বাহুতে অঙ্গদ, গলায় মণিমাল্য। কী বাহার। ঋষিমুনিদের দেহ

থেকে আলো পড়ছিল ঠিক্‌রিয়ে। কণ্ঠ থেকে উঠছিল অনিন্দ্যসুন্দর সুরে সুমধুর সামগান, ত্রিভুবনের শরীর রোমাঞ্চিত। হঠাৎ দুড়দাড় ক'রে এসে পড়ল বিশ্রীবিরূপের বেসুরী দল—শুচিসুন্দরের সৌকুমার্য্য মুহূর্ত্তে লণ্ডভণ্ড। কুশ্রীর কাছে সুশ্রীর হার, বেসুরের কাছে সুরের—পুরাণে এ কথা কীর্ত্তিত হয়েছে কী আনন্দে, কী অট্টহাস্যে, অন্নদামঙ্গলের পাতা ওলটালেই তা টের পাবে। এই তো দেখছ বেসুরের শাস্ত্রসম্মত ট্র্যাডিশন্‌। ঐ যে তুন্দিলতনু গজানন সর্ব্বাগ্রে পেয়ে থাকেন পুজো—এটাই তো চোখ-ভোলানো দুর্ব্বল ললিত-কলার বিরুদ্ধে স্থূলতম প্রোটেস্‌ট। বর্ত্তমান যুগে ঐ গণেশের শুঁড়ই তো চিম্‌নি মূর্ত্তি ধ'রে পাশ্চাত্য পণ্য যজ্ঞশালায় বৃংহিতধ্বনি করছে। গণ-নায়কের এই কুৎসিত বেসুরের জোরেই কি ওরা সিদ্ধিলাভ করছে না। চিন্তা ক'রে দেখো।

দেখব।

যখন করবে তখন এ কথাটাও ভেবে দেখো, বেসুরের অজেয় মাহাত্ম্য কঠিন ডাঙাতেই। সিংহ বলো ব্যাঘ্র বলো বলদ বলো যাদের সঙ্গে সগর্ব্বে বীরপুরুষদের তুলনা করা হয় তারা কোনো কালে ওস্তাদজির কাছে গলা সাধে নি। এ কথায় তোমার সন্দেহ আছে কি।

তিলমাত্র না।

এমন কি ডাঙার অধম পশু যে গর্দ্দভ, যত দুর্ব্বল সে হোক্‌ না, বীণাপাণির আসরে সে সাক্রেদি করতে যায় নি একথা তার শত্রু মিত্র একবাক্যে স্বীকার করবে।

তা করবে।

ঘোড়া তো পোষমানা জীব,—লাথি মারবার যোগ্য খুর থাকা সত্ত্বেও নির্ব্বিবাদে চাবুক খেয়ে মরে—তার উচিত ছিল আস্তাবলে খাড়া দাঁড়িয়ে ঝিঁঝিঁটখাম্বাজ আলাপ করা। তার চিঁহিঁ হিঁ হিঁ শব্দে সে রাশি রাশি সফেন

চন্দ্রবিন্দুবর্ষণ করে বটে তবু বেস্থুরো অনুনাসিকে সে ডাণ্ডার সম্মান রক্ষা করতে ভোলে না। আর গজরাজ—তাঁর কথা বলাই বাহুল্য। পশুপতির কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত এই সমস্ত স্থলচর জীবের মধ্যে কি একটাও কোকিলকণ্ঠ বের করতে পারো। ঐ যে তোমার বুলডগ্ ফ্রেডি চীৎকারে ঘুমছাড়া করে পাড়া, ওর গলায় দয়া ক'রে বা মজা ক'রে বিধাতা যদি দেন শ্যামা দোয়েলের শিষ, ও তাহোলে নিজের মধুর কণ্ঠের অসহ্য ধিক্কারে তোমার চল্‌তি মোটরের তলায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে এ আমি বাজি রাখতে পারি। আচ্ছা সত্যি ক'রে বলো, কালীঘাটের পাঁঠা যদি কর্কশ ভ্যাভ্যা না ক'রে রামকেলি ভাঁজতে থাকে তাহোলে তুমি তাকে জগন্মাতার পবিত্র মন্দির থেকে দূর দূর ক'রে খেদিয়ে দেবে না কি।

নিশ্চয় দেব।

তাহোলে বুঝতে পারছ, আমরা যে সুমহৎ ব্রত নিয়েছি তার সার্থকতা। আমরা শক্ত ডাণ্ডার শাক্ত সন্তান, বেস্থুরমন্ত্রে দীক্ষিত। আধমরা দেশের চিকিৎসায় প্রয়োগ করতে চাই চরম মুষ্টিযোগ। জাগরণ চাই, বল চাই। জাগরণ সুরু হয়েছে পাড়ায়, প্রতিবেশীদের বলিষ্ঠতা দুমদাম শব্দে দুর্দ্দাম হচ্চে, পৃষ্ঠদেশে তার প্রমাণ পাচ্চে আমার চেলারা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোতোয়ালরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, টনক নড়েছে শাসনকর্ত্তাদের।

তোমার গুরু বলছেন কী।

তিনি মহানন্দে মগ্ন। দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্চেন বেস্থুরের নবযুগ এসেছে সমস্ত জগতে। সভ্যজাতরা আজ বলছে বেস্থুরটাতেই বাস্তব, ওতেই পুঞ্জীভূত পৌরুষ, সুরের মেয়েমানুষিই দুর্ব্বল করেছে সভ্যতা। ওদের শাসন-কর্ত্তা বলছে জোর চাই, খৃষ্টানি চাইনে। রাষ্ট্রবিধিতে বেস্থুর চড়ে যাচ্চে পর্দ্দায় পর্দ্দায়। সেটা কি তোমার চোখে পড়েনি দাদা।

চোখে পড়বার দরকার কী ভাই। পিঠে পড়ছে দমাদ্দম।

এদিকে বেতালপঞ্চবিংশতিই চাপল সাহিত্যের ঘাড়ে। আনন্দ করো—বাংলাও ওদের পাছু ধরেছে।

সে তো দেখছি।—পাছু ধরতে বাংলা কোনোদিন পিছপাও নয়।

এদিকে গুরুর আদেশে বেসুর মন্ত্র সাধন করবার জন্যে আমরা হৈ হৈ সঙ্ঘ স্থাপন করেছি। দলে একজন কবি জুটেছে। তার চেহারা দেখে আশা হয়েছিল নব যুগ মূর্ত্তিমান। রচনা দেখে ভুল ভাঙল—দেখি তোমারি চেলা। হাজারবার ক'রে বলছি, ছন্দের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলো গদাঘাতে, বলছি, অর্থমনর্থং ভাবয়নিত্যং, বুঝিয়ে দিলেম, কথার মানেটাকে সম্মান করায় কেবল দাসবুদ্ধির গাঁঠপড়া মনটাই ধরা পড়ে; ফল হচ্চে না। বেচারার দোষ নেই—গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে ওঠে তবু ভদ্রলোকী কাব্যের ছাঁদ ঘোচাতে পারে না। ওকে রেখেছি পরীক্ষাধীনে। প্রথম নমুনা যেটা সমিতির কাছে দাখিল করেছে সেটা শুনিয়ে দিই। সুর দিয়ে শোনাতে পারব না।

সেই জন্যেই তোমাকে ঘরে ঢুকতে দিতে সাহস হয়।

তবে অবধান করো:—

পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে।
হৈ হৈ পাড়া ছেড়ে দূর দিয়ে যাইয়ে।
হেথা সারে গামা পায়ে সুরাসুরে যুদ্ধ,
শুদ্ধ কোমলগুলো বেবাক্ অশুদ্ধ—
অভেদ রাগিণীরাগে ভগিনী ও ভাইয়ে।
তার-ছেঁড়া তম্বুরা তালকাটা বাজিয়ে
দিনরাত বেধে যায় কাজিয়ে।
ঝাঁপতালে দাদ্‌রায় চৌতালে ধামারে
এলোমেলো ঘা মারে—
তেরে কেটে মেরে কেটে ধাঁ ধাঁ ধাঁ ধাঁ ধাঁইয়ে॥

সভাসুদ্ধ একবাক্যে ব'লে উঠলুম, এ চলবে না। এখনো জাতের মায়া

ছাড়তে পারেনি—শুচিবায়ুগ্রস্ত,—নাড়ী দুর্ব্বল। আমরা বেছন্দ চাই বে-পরোয়া। কবির মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া গেল। বললুম, আরো একবার কোমর বেঁধে লাগো, বাঙালি ছেলেদের কানে জোরের কথা হাতুড়ি পিটিয়ে চালিয়ে দাও, মনে রেখো পিটুনির চোটে ঠেলা মেরে জোর চালানো আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রচলিত।—বাঙালি শুধু কি ঘুমায়ে রয়। দেখলুম লোকটার অন্তঃকরণ পাক খেয়ে উঠেছে। ব'লে উঠল, নয় নয় কখনোই নয়। কলমটাকে কামড়ে ধ'রে ছুটে গিয়ে বসল টেবিলে। করজোড়ে গণেশকে বললে, তোমার কলাবধূকে পাঠিয়ে দাও অন্তঃপুরে, সিদ্ধিদাতা। লাগাও তোমার শুঁড়ের আছাড় আমার মগজে, ভূমিকম্প লাগুক আমার মাতৃভাষায়, জোরের তপ্ত পঙ্ক উৎসারিত হোক্ কলমের মুখে, দুঃশ্রাব্যের চোটে বাঙালির ছেলেকে দিক্ জাগিয়ে। কবি মিনিট পনেরো পরে বেরিয়ে চীৎকার সুরে আবৃত্তি সুরু করলে। মুখ চোখ লাল, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, দশা পাবার দশা।

মার্ মার্ মার্ রবে মার্ গাট্টা
মারহাট্টা, ওরে মারহাট্টা।
    ছুটে আয় দুদ্দাড়,
    ভাঙ্ মাথা, ভাঙ্ হাড়,
কোথা তোর বাসা আছে হাড়কাট্টা।
    আন্ ঘুষো, আন্ কিল,
    আন্ ঢেলা, আন্ ঢিল,
নাক মুখ থেঁতো ক'রে দিক্ ঠাট্টা।
    আগড়ুম বাগড়ুম
    দুমদাম ধুমাধুম,
ভেঙে চুরে চুরমার হোক্ খাট্টা।
ঘুম যাক্, মারো কষে মালসাট্টা।

বাঁশি-ওলা চুপ্ রাও,
টান মেরে উপড়াও,
ধরা হতে ললিতলবঙ্গলতা।
বেল জুঁই চম্পক
দূরে দিক ঝম্পক,
উপবনে জমা হোক জঙ্গলতা।

আমি অস্থির হয়ে দুই হাত তুলে বললুম,—থামো, থামো, আর নয়। জয়দেবের ভূত এখনো কাঁধে বসে ছন্দের সার্কাস করছে, কানের দখল ছাড়েনি। গয়াধামে ঐ লেখাটার যদি পিণ্ডি দিতে চাও তবে ওর উপরে হানো মুষল, ওটাকে ছিরকুটে নাস্তা-নাবুদ ক'রে তার উপরে ফুট্‌কি বৃষ্টি করো।

কবি হাত জোড় ক'রে বললে, আমি পারব না—তুমি হাত লাগাও।

আমি বললুম, ঐ যে মারহাট্টা শব্দটা তোমার মাথায় এসেছে ঐটেতেই তোমার ভবিষ্যতের আশা। 'চলন্তিকা'থেকে কথাটাকে ছিঁড়ে ফেলেছ, অর্থের শিকড়টা রয়ে গেল মাটির নিচে। শুধু ডাঁটা ধ'রে খাড়া রয়েছে ধ্বনির মার-মূর্ত্তি। এইবার সমস্তটাকে ছন্নছাড়া করে দিই—

দেখো, কী মূর্ত্তি বেরোয়।—

হৈ রে হৈ মারহাট্টা
গাল পাট্টা
আঁটসাট্টা।

*　　*　　*　　*

হাড়কাট্টা ক্যাঁ কোঁ কাঁচ্
গড়গড় গড়গড়। . . . .
হুড়্দুম্‌দুদ্দাড়

ডাণ্ডা

ধপাং

ঠাণ্ডা

কম্পাউণ্ড ফ্র্যাক্‌চার

*   *   *   *

মড়মড় মড়মড়

দুড়ুম . . . . .

হুড়মুড় হুড়মুড়

দেউকিনন্দন

ঝঞ্ঝন পাণ্ডে

কুন্দন গাড়োয়ান

বাঁকে বিহারী

তড়বড় তড়বড় তড়বড় তড়বড়

খটখট মস্‌মস্‌

ধড়াব্বড়

ধড়ফড় ধড়ফড়

হো হো হু হু হা হা—

ট ঠ ড ঢ ড় ঢ় হঃ—

ইনফর্নো হেডিস্‌ লিম্বো।

দাদা তোমার নকল করিনি এই সার্টিফিকেট আমাকে দিতে হবে।

খুসি হয়ে দেব।

নবযুগের মহাকাব্য তোমাকে লিখতে হবে দাদা।

যদি পারি। বিষয়টা কী।

বেসুর হিড়িম্বের দিগ্বিজয়।

পুপুদিদিকে জিগেস করলুম, কেমন লাগল।

পুপু বললে, ধাঁধাঁ লাগল।

অর্থাৎ।

অর্থাৎ সুরাসুরের যুদ্ধে অসুরের জয়টা কেন আমার তেমন খারাপ লাগল না তাই ভাবছি। বিশ্রী গোঁয়ারটার দিকেই রায় দিতে চাচ্চে মন।

তার কারণ তুমি স্ত্রীজাতীয়। অত্যাচারের মোহ কাটেনি। মার খেয়ে আনন্দ পাও মারবার শক্তিটাকে প্রত্যক্ষ দেখে।

অত্যাচারের আক্রমণ পছন্দসই তা বলতে পারিনে—কিন্তু বীভৎসমূর্ত্তিতে যে পৌরুষ ঘুষি উঁচিয়ে দাঁড়ায়, তাকে মনে হয় সাব্লাইম্।

আমার মতটা বলি। দুঃশাসনের আস্ফালনটা পৌরুষ নয়—একেবারে উল্টো। আজ পর্য্যন্ত পুরুষই সৃষ্টি করেছে সুন্দর। লড়াই করেছে বেসুরের সঙ্গে। অসুর সেই পরিমাণেই জোরের ভান করে, যে পরিমাণে পুরুষ হয় কাপুরুষ। আজ পৃথিবীতে তারই প্রমাণ পাচ্চি।

১৩

পুপুদিদির মনে হোলো আমি ওর মর্য্যাদাহানি করেছি। তখন সন্ধে হয়ে আসছে। কেদারায় হেলান দিয়ে ও বসল আমার কাছে। অন্যদিকে মুখ ক'রে বললে, তুমি আমাকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে কেবল ছেলেমানুষি করছ, এতে তোমার কী সুখ।

আজকাল ওর কথা শুনে হাসতে সাহস হয় না। ভালোমানুষের মতো মুখ করেই বললুম,—তোমার বয়সে পাকা বুদ্ধির প্রমাণ দিতেই তোমাদের আগ্রহ, আমার বয়সে ভাবতে ভালো লাগে যে মজ্জাটা এখনো আছে কাঁচা। সুযোগ পেলে মশগুল্ হয়ে ছেলেমানুষি করি বানিয়ে, হয়তো মানানসই হয় না।

তাই ব'লে আগাগোড়াই যদি ছেলেমানুষি করো তাহোলে সত্যিকার ছেলেমানুষিই হয় না। ছেলে বয়সের ভিতরে ভিতরে বড়ো বয়সের মিশল থাকে।

দিদি, এটা একটা কথার মতো কথা বলেছ। শিশুর কোমল দেহেও শক্ত হাড়ের গোড়া-পত্তন থাকে। এ কথাটা আমি ভুলেছিলুম না কি।

তোমার বকুনি শুনে মনে হয় যখন আমি ছোটো ছিলুম তখনকার দিনে এমন কিছুই ছিল না যা ব্যঙ্গ করবার নয় অথচ মজা করবার।

একটা উদাহরণ দেখাও।

মনে করো আমাদের মাষ্টারমশায়। তিনি অদ্ভুত ছিলেন, কিন্তু খাঁটি অদ্ভুত। তাই তাঁকে এত ভালো লাগত।

আচ্ছা তাঁর কথাটা একটু ধরিয়ে দাও না।

আজো তাঁর মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ে। ক্লাসে বসতেন যেন আলগোছে, বইগুলো ছিল কণ্ঠস্থ। উপরের দিকে তাকিয়ে পাঠ ব'লে যেতেন, কথাগুলো যেন সদ্য ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে। আমরা ক্লাসে উপস্থিত থাকব, মন দিয়ে পড়া শুনব, সে গরজটা সম্পূর্ণ আমাদেরই ব'লে তিনি মনে করতেন।

তিনি তোমাদের মুখ চেনবার সুযোগ পাননি বোধ হয়।

চেষ্টাও করেননি। একদিন ছুটির দরবার নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি শশব্যস্ত হয়ে চৌকি ছেড়ে উঠে পড়লেন, মনে করলেন আমি বুঝি যাকে বলে একজন রীতিমতো মহিলা।

অমনতরো অভাবনীয় ভুল করা তাঁর অভ্যস্ত ছিল।

ছিল বই কি। তোমার দাড়ি দেখে কোনোদিন তোমাকে নবাব খাঞ্জেখাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি ব'লে ভুল করেন নি তো। না ঠাট্টা নয়, তিনি তো তোমার বন্ধু ছিলেন, বলো না তাঁর কথা।

তাঁর শত্রু কেউ ছিল না, কিন্তু সমজদার বন্ধু ছিলুম একলা আমি। লোকে যখন তাঁর ক্ষ্যাপামির কথা রটাত তিনি আশ্চর্য্য হয়ে যেতেন। একদিন আমাকে এসে বললেন, সবাই বলছে আমি ক্লাস পড়াই কিন্তু ক্লাসের দিকে তাকাইনে।

আমি বললুম, তোমার সাঙাৎরা তোমার বিদ্যের দোষ ধরতে পারে না তোমার বুদ্ধির দোষ ধরে। তারা বলে, তোমার পড়ানোর ভুল হয় না কিন্তু পড়াচ্চ যে সেইটেই ভুলে যাও।

পড়াচ্চি যদি না ভুলি তবে পড়াতে পারতুম না, নিছক মাষ্টারিই করে যেতুম। পড়ানোটা নিঃশেষে হজম হয়ে গেছে, ওটা নিয়ে মনটা আইঢাই করে না।

জলচর জলে সাঁতার দিলে টের পাওয়া যায় না, স্থলচর দিলে সেটা খুবই মালুম হয়। তুমি অধ্যাপন সরোবরের গভীর জলের মাছ।

আমি যদি ছাত্রদের দিকেই তাকাই তবে ক্লাসের দিকে মন দেব কী ক'রে।

তোমার সেই ক্লাসটা আছে কোথায়।

কোথাও না, সেইজন্যেই তো বাধা পাইনে। ছাত্ররাই যদি আমার চোখ জুড়ে বসে তাহোলে ক্লাসের আত্মাপুরুষটা আড়ালে পড়ে যে।

"পড়ো বাবা আত্মারাম"—এই বুঝি তোমার বুলি।

পড়াচ্চি কই। আমার আত্মারামকেই টহল দেওয়াচ্চি।

তোমার প্রণালীটা কী রকম।

গঙ্গাধারার বহে যাবার প্রণালী যে রকম। ডাইনে বাঁয়ে কোথাও মরু, কোথাও ফসল, কোথাও শ্মশান, কোথাও সহর। এই নিয়ে গঙ্গামায়ীকে পদে পদে বিচার করতে যদি হোত তাহোলে আজ পর্য্যন্ত সগরসন্তানদের উদ্ধার হোত না। যাদের যতটা হবার তাই হয়, বিধাতার সঙ্গে টক্কর দিয়ে তার চেয়ে বেশি হওয়াতে গেলেই চলা বন্ধ। আমার পড়ানো চলে মেঘের মতো শূন্য দিয়ে, বর্ষণ হয় নানা ক্ষেতে, ফসল ফলে ক্ষেত অনুসারে। অসম্ভবকে নিয়ে ঠেলাঠেলি ক'রে সময় নষ্ট করিনে ব'লে হেডমাষ্টার হন ক্ষাপা। ঐ হেডমাষ্টারটিকেও অত্যন্ত সত্য ব'লে গণ্য করলে অত্যন্ত ভুল করা হয়।

পুপু বললে, ছাত্রীদের অনেকে মনে মনে খুঁৎখুঁৎ করত। তাদের লক্ষ্য করে একদিন বলেছিলেন, এখানে যে মাষ্টারটা আছে তাকে নেই ক'রে দিয়েছি, তোমাদের নিজের মনকেই বেড়ে ওঠবার জায়গা করে দেবার জন্যেই। আর একদিন তিনি বলেছিলেন, মাষ্টারিতে আমি হচ্চি ক্লাসিক, আর সিধুবাবু রোমান্টিক। বলা বাহুল্য মাষ্টারমশায়ের কথাটা আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি।

মানে হচ্চে, মাষ্টার সমগ্র ক্লাসকেই দিতেন উপরে তুলে, আর সিধু ছাত্রদের একে একে নিজের কাঁধে চড়িয়ে গর্ত্তগাড়ি পার করত। বুঝেছ।

না, বোঝবার দরকার নেই। তুমি তাঁর কথা ব'লে যাও, মজা লাগে শুনতে।

আমারো লাগে, কেননা লোকটাকে বুঝতে লাগে দেরি। একদিন চীন দার্শনিকের দোহাই দিয়ে মাষ্টার আমাকে বললে, যে-রাজ্যে রাজত্বটা নেই সেই রাজ্যই সকল রাজ্যের সেরা।

পুপে সগর্ব্বে বললে, আমাদের ক্লাস সেরা ক্লাস ছিল সন্দেহ নেই।

আমি বললুম, তার কারণ, প্রমাণ সত্ত্বেও তোমার কমবুদ্ধির লক্ষণ মাষ্টার লক্ষ্য করতেন না।

পুপে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, এটাকে কি গাল বলব, না ঠাট্টা।

আমি বললুম, পাশ দিয়ে যেতে যেতে তোমার চুলটা টেনে দিই, এ ঠাট্টা সেই স্নিগ্ধ জাতের। এতে ক্যাসাস্ ব্যালাই, অর্থাৎ অত্য যুদ্ধ ত্বয়া ময়ার ঘোষণা নেই।

পুপে বললে, মাষ্টার মশায়ের ব্যবস্থা ছিল মজার রকমের। তিনি বলতেন, তোমাদের নিজের খবর নিজেই রাখবে: তোমাদের খবরদারি করবার কাজ আমার নয়। প্রতিদিনের পড়ার ফল নিজেরাই রাখতুম--মার্কা দেবার নিয়ম জানা ছিল।

তার ফল কী হোলো।

মার্কা বরঞ্চ কম করেই দিতুম।

কখনো কি ঠকাতে না।

বাইরের কেউ মার্কা দেবার থাকলে তাকে ঠকাবার লোভ হোতে পারত। নিজেকে ঠকানো বোকামি। বিশেষত তিনি তো দেখতেন না।

তারপরে।

তারপরে প্রত্যেক তিনমাস অন্তর নিজেরাই হিসেব ক'রে জানতুম উঠছি কি নাবছি।

তোমাদের কি সত্যযুগের হাইস্কুল, অত্যন্ত হাই। ফাঁকি দেবার লোকই বুঝি ছিল না।

মাষ্টার মশায় ছিলেন অবিচলিত। তিনি বলতেন, সংসারে একদল লোক ফাঁকি দেবেই। কিন্তু নিজের দায় যাদের নিজের হাতে, ওরি মধ্যে তারাই কম ফাঁকি দেয়। আমাদের শাস্তিও ছিল ঐ জাতের। বাইরে থেকে না। একদিন হাজিরি নামডাক উপলক্ষ্যে প্রিয়সখীর পর্সেণ্টেজ্ বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলে ফেলেছিলুম। তিনি বললেন, অশুচি হয়েছ, প্রায়শ্চিত্ত কোরো। তিনি জানতেও চাইতেন না করেছি কি না।

প্রায়শ্চিত্ত কি করেছিলে।

নিশ্চয়ই করেছিলুম।

অর্থাৎ তোমার পাউডরের কৌটোটা ঐ প্রিয়সখীকে দান করেছিলে।

আমি কখ্খনো পাউডর মাখিনে।

বলতে চাও, তোমার ঐ মুখের রঙ্ তোমার খায নিজেরই।

আর যাই হোক্ তোমার কাছ থেকে ধার নিইনি, মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।

ছি, আমাকে নিয়ে তোমার দৃষ্টিতে যদি ভেদবুদ্ধি দেখা দেয় তাহোলে জাতে দোষারোপ ঘটে। আমরা যে সবর্ণ—বর্ণভেদের জো কী। হাতের কাছে কবি থাকলে বলতেন, তোমার গায়ের রং ফুটে বেরিয়েছে ব্রহ্মার হাসি থেকে।

আর তোমার রং তাঁর ঠাট্টার হাসি থেকে।

এ'কেই বলে অন্যোন্য স্তুতি, ম্যুচুয়ল অ্যাড্‌মিরেশন। পিতামহের দুই জাতের হাসি আছে, একটা দন্ত্য একটা মূর্দ্ধণ্য। আমাতে লেগেছে মূর্দ্ধণ্য হাসি, ইংরেজিতে তাকে বলে উইট্।

দাদামশায়, নিজের গুণগান তোমার মুখে কখনো বাধে না।

সেইটেই আমার প্রধান গুণ। আপনাকে যারা জানে আমি সেই অসামান্যের দলে।

মুখ খুলে গেছে, কিন্তু আর নয়, এবার থামো। মাষ্টারমশায়ের কথা হচ্ছিল এখন উঠে পড়ল তোমার নিজের কথা।

তাতে দোষ হয়েছে কী। বিষয়টা তো উপাদেয়, যাকে বলে ইন্টারেষ্টিঙ্।

বিষয়টা সর্ব্বদাই রয়েছে সামনে। তাকে তো স্মরণ করবার দরকার হয় না। তাকে যে ভোলাই শক্ত।

আচ্ছা, তাহোলে মাষ্টারের একটা বিশেষ পরিচয় দিই তোমাকে। এটা টুঁকে রাখবার যোগ্য। একদিন সন্ধ্যেবেলায় মাষ্টার জনকয়েক লোককে নেমন্তন্ন করেছিল। খবরটা তার মনে আছে কি না জানবার জন্যে সকাল সকাল গেলুম্ তার বাড়িতে। সেবক কানাইএর সঙ্গে তার যে আলোচনাটা চলছিল, বলি সে কথাটা। কানাই বললে, জগদ্ধাত্রী পূজোর বাজারে গলদা চিংড়ির দাম চড়ে গেছে তাই এনেছি ডিমওয়ালা কাঁকড়া। মাষ্টার ঈষৎ চিন্তিত হয়ে বললে, কাঁকড়া কী হবে। ও বললে, লাউ দিয়ে ঝোল, সে তোফা হবে। আমি বললুম, মাষ্টার, গল্দা চিংড়ির উপর তোমার লোভ ছিল।

মাষ্টার বললে, ছিল বই কী।

তাহোলে তো লোভ সম্বরণ করতে হবে।

তা কেন। লোভটা প্রস্তুত হয়েই আছে তাকে শান্ট্ ক'রে চালিয়ে দেব কাঁকড়ার লাইনে।

দেখছি, তোমাকে বিস্তর শান্ট্ করতে হয়।

মাষ্টার বললে, কাঁকড়ার ঝোল তো খেয়েছি অনেকবার। সম্পূর্ণ মন দিইনি। এবার যখন দেখলুম কানাইয়ের জিভে জল এসেছে তখন তার সিক্ত রসনার নির্দ্দেশে খাবার সময় মনটা ঝুঁকে পড়বে কাঁকড়ার দিকে, রসটা

পাব বেশি ক'রে। কাঁকড়ার ঝোলটাকে ও যেন লাল পেনসিলে আণ্ডর-লাইন্ ক'রে দিলে, ওটাকে ভালো ক'রে মুখস্থ করবার পক্ষে সুবিধে হোলো আমার।

মাষ্টার জিগেস করলে, আঁঠি-বাঁধা ওটা কী এনেছিস। কানাই বললে, সজনের ডাঁটা। মাষ্টার সগর্ব্বে আমার দিকে চেয়ে বললে, এই দেখো মজা। ও বাজারে যাবার সময় আমার মনে ছিল লাউডগা। ও বাজার থেকে ফিরে এল, আমি পেয়ে গেলুম সজনের ডাঁটা। হুকুম না করবার এই সুবিধে।

আমি বললুম, সজনের ডাঁটা না এনে ও যদি আন্‌ত চিচিঙ্গে।

মাষ্টার জবাব দিলেন, তাহোলে ক্ষণকালের জন্যে ভাবনা করতে হোত। নাম জিনিষটার প্রভাব আছে। চিচিঙ্গে শব্দটা লোভজনক নয়। কিন্তু কানাই যদি ওটা বিশেষ ক'রে বাছাই ক'রে আনত, তাহোলে সংস্কার কাটাবার একটা উপলক্ষ্য হোত। জীবনে সব প্রথমে ভেবে দেখবার সুযোগ হোত দেখাই যাক্ না; হয়তো আবিষ্কার করতুম, ওটা মন্দ চলে না। চিচিঙে পদার্থটার বিরুদ্ধে অন্ধবিরাগ দূর হয়ে উপভোগ্যের সীমানা বেড়ে যেত। এমনি ক'রেই কাব্যে কবিরা তো নিজের রুচিতে আমাদের রুচির প্রসার বাড়িয়ে দিচ্চে। সৃষ্টিকে আণ্ডরলাইন করাই তাদের কাজ।

তোমার রুচির প্রসার বাড়াবার কাজে কানাইয়ের আরো এমন হাত আছে।

আছে বই কি। ও না থাকলে পিড়িং শাকে আমি কোনোদিন মনোযোগই দিতুম না। শব্দটা আমাকে মারত ধাক্কা। সংসারে সংস্কার-মুক্তিই তো অধিকারব্যাপ্তি।

সেই মহৎ কাজে আছে তোমার কানাই।

তা মানতে হবে ভাই। ওর ইচ্ছার যোগে আমার ইচ্ছার সঙ্কীর্ণতা ঘুচে যায় প্রতিদিন। আমি একলা থাকলে এমনটা ঘটত না।

বুঝলুম, কিন্তু কানাইয়ের ইচ্ছার সীমানাটা—

বাড়িয়েছি বই কি। পূর্ব্ববঙ্গের লোক, কলাইয়ের ডালের নাম শুনতে পারত না। আজকাল হিং দিয়ে কলাইয়ের ডাল ও খাচ্চে বেশ।

এমন সময়ে কানাইয়ের পুনঃ প্রবেশ। বললে, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, আজ দইটা আনিনি। কবরেজমশায় বলেন, রাত্রে দইটা বারণ।—দইয়ের দাম চড়ে গেছে বললে দ্বিরুক্তি হয় এইজন্যে কবরেজমশায়কে পাড়তে হোলো। সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললে, অল্প একটু আদার রস মিশিয়ে পাৎলা চা বানিয়ে দেব, শীতের রাত্রে উপকার দেবে।

আমি জিগেস করলেম, কী বলো হে মাষ্টার, আদা দিয়ে চা সবাইকে খাওয়াবে না কী।

সবাইকার কথা বলব কী ক'রে। যারা খাবে তারা খাবে। হোতে পারে উপকার। যারা খাবে না তাদের অপকার হবে না।

আমি বললুম, মাষ্টার, চীন দার্শনিকের উপদেশমতে তোমার গেরস্থালিতে মনিব নেই বুঝি।

না।

তাহোলে চাকরই বা আছে কেন।

মনিব না থাকলেই চাকর স্বতই থাকে না।

তোমার এখানে চাকরে মনিবে বেমালুম মিশিয়ে গিয়ে একটা যৌগিক পদার্থ খাড়া হয়েছে বুঝি।

মাষ্টার হেসে বললে, অক্সিজেন হাইড্রোজেনের দাহ্য মেজাজ ঘুচে গিয়ে দোঁহে মিলে একেবারে জল।

আমি বললুম, যদি বিয়ে করতে ভায়া, পাড়া ছেড়ে চীনের দর্শন দৌড় দিত। থেকেও থাকবে না গিন্নি এমন নির্ব্বিশেষ পদার্থ নয়। মুখের উপর ঘোমটা টেনেও তোমার সংসারে সে হোত অতিশয় স্পষ্ট। তার রাজ্যে

রাজত্বটা তার কটাক্ষে খেত দোলা—সর্ব্বদা ধাক্কা লাগাত কখনো পিঠে কখনো বুকে।

মাষ্টার বললে, তাহোলে কর্ত্তা রিটর্ণ টিকিট না কিনেই দৌড় মারত ডেরা-গাঁজিখাঁয়ে, গিন্নিত্ব অন্তর্ধান করত ইষ্টারন্ বেঙ্গল্ রেলের রাস্তা বেয়ে বাপের বাড়িতে।

মাষ্টার মাঝে মাঝে হাসির কথা বলে কিন্তু হাসে না।

পুপুদিদি বললে, আমাদের মাষ্টারমশায়কে নিয়ে যদি গল্পের পালা বাঁধতে হয় কী রকম ক'রে বাঁধো।

তাহোলে দশলক্ষ বছর বাদ দিই।

তার মানে আজগুবি গল্প বানাতে। অথচ আজকের দিনের বিরুদ্ধপক্ষের সাক্ষীর শঙ্কা থাকত না।

কোনো সাহিত্যওয়ালা কখনো সাক্ষীর ভয় করে না। আসল কথা আমার গল্পটা ফুটে উঠতে যুগান্তরের দরকার করবে। কেন, সেইটে বুঝিয়ে বলি।

পৃথিবী-সৃষ্টির গোড়াকার মালমসলা ছিল পাথর লোহা প্রভৃতি মোটা মোটা ভারি ভারি জিনিষ। তারই ঢালাই পেটাই চলেছিল অনেককাল। কঠোরের বেআব্রুতা ছিল বহুযুগ ধ'রে। অবশেষে নরমমাটি পৃথিবীকে শ্যামল আস্তরণে ঢাকা দিয়ে সৃষ্টিকর্ত্তার যেন লজ্জা রক্ষা করলে। তখন জীবজন্তু আসরে নামল স্তূপাকার হাড় মাংসের বোঝাই নিয়ে; মোটা মোটা বর্ম্ম প'রে তারা দুশো পাঁচশো মোণ অসভ্য ল্যাজ টেনে টেনে বেড়াতে লাগল। তারা ছিল দর্শনধারী জীব। কিন্তু সেই মাংসবাহীর দল সৃষ্টিকর্ত্তার পছন্দসই হোলো না। আবার চলল বহু যুগ ধরে নিষ্ঠুর পরীক্ষা। শেষকালে এল মনোবাহী মানুষ। ল্যাজের বাহুল্য গেল ঘুচে, হাড়মাংস হোলো পরিমিত, কড়া চামড়াটা নরম হয়ে এল ত্বকে। না রইল শিং, না রইল ক্ষুর, না রইল

নখের জোর, চার পা এসে ঠেকল দুটিমাত্র পায়ে। বোঝা গেল বিধাতা তাঁর হাতিয়ার চালাচ্চেন সৃষ্টির যুগটাকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ক'রে আনবার জন্যে। স্থূলে সূক্ষ্মে জড়িয়ে আছে মানুষ। মনের সঙ্গে মাংসের চলেছে ঠেলাঠেলি মারামারি। বিধাতা পুনশ্চ মাথা নাড়ছেন, উঁহু হোলো না। লক্ষণ দেখা যাচ্চে এটাও টিঁকবে না, এ আপনিই আপনাকে নিকেশ করে দেবে আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে। যাবে কয়েক লক্ষ বছর কেটে। মাংস পড়বে ঝরে, মন উঠবে একেশ্বর হয়ে। সেই বিশুদ্ধ মনের যুগে তোমার মাষ্টারমশায় বসেছেন শরীররিক্ত ক্লাসে। মনে করে দেখো তাঁর শিক্ষা দেবার প্রণালী হচ্চে ছাত্রদের মধ্যে নিজেকে মেলাতে থাকা, মনের উপর মন বিছিয়ে ; বাইরের বাধা নেই বললেই হয়।

স্থূলবুদ্ধির বাধাও নেই।

সেটা না থাকলে বুদ্ধি মাত্রই হয়ে পড়ে বেকার। ভালোমন্দ বোকা বুদ্ধিমানের ভেদ আছেই। চরিত্র আছে নানারকমের। ভাবের বৈচিত্র্য আছে, ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য আছে। এখন তিনিই ভালো মাষ্টার যিনি সেই অনেকের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন, শিক্ষা এখন অন্তরে অন্তরে।

দাদামশায়, ইস্কুলটা কোথায় আছে সেটা ঠিক মনে আনতে পারছিনে।

পৃথিবীতে তিনটে বাসা আছে—এক সমুদ্রতলে, আর এক ভূতলে, আর আছে আকাশে, যেখানে সূক্ষ্ম হাওয়া আব সূক্ষ্মতর আলো। এইখানটা আজ আছে খালি আগামী যুগের জন্যে।

তাহোলে তোমার ক্লাস চলেছে সেই হাওয়ায় সেই আলোয়। কিন্তু ছাত্রদের চেহারাটা কী রকম।

বুঝিয়ে বলা শক্ত, তাদের আকার নিশ্চয়ই আছে কিন্তু আকারের আধার নেই।

তাহোলে বোধ হচ্চে নানা রঙের আলোয় তা'রা গড়া।

সেইটেই সম্ভব। তোমাদের বিজ্ঞান মাষ্টার তো সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন—বিশ্বজগতে সূক্ষ্ম আলোর কণাই বহুরূপী হয়ে স্থূলরূপের ভান করছে। সেদিন আলো আপন আদিম সূক্ষ্মরূপেই প্রকাশ পাবে। ক্লাসে তোমরা সবাই আলো করে বসবে। সেদিন ওটিন-স্নো-ওয়ালারা একেবারে দেউলে হয়ে গেছে।

দেউলে কেন, আলো হয়ে গেছে।

দেউলে হয়ে যাওয়ার মানেই তো আলো হয়ে যাওয়া।

আমি কোন্ রঙের আলো হব দাদামশায়।

সোনার রঙের।

আর তুমি।

আমি একেবারে বিশুদ্ধ রেডিয়ম।

সেদিন আলোয় আলোয় লড়াই হবে না তো, ইলেক্‌ট্রন নিয়ে হবে না কি কাড়াকাড়ি।

ভাবনা ধরিয়ে দিলে। লীগ্ অফ্ লাইট্‌সের দরকার হবে বোধ হচ্চে। ইলেক্‌ট্রন নিয়ে টানাটানির গুজব এখনি শুনতে পাচ্চি।

ভালোই তো দাদামশায়। বীররসের কবিতা তোমার ভাষায় উজ্জ্বল বর্ণে বর্ণিত হবে। ঐ যাঃ, ভাষা থাকবে তো।

শব্দের ভাষা নিছক ভাবের ভাষায় গিয়ে পৌঁছবে—ব্যাকরণ মুখস্থ করতে হবে না।

আচ্ছা গান।

গান হবে রঙের সঙ্গত। বড়ো সহজ হবে না। তান যখন ঠিকরে পড়তে থাকবে, ঝলক মারবে আকাশের দিকে দিকে। তখনকার তানসেনরা দিগন্তে অরোরা বোরিয়ালিস্ বানিয়ে দেবে।

আর তোমার গদ্যকাব্য কী হবে বলো তো।

তাতে লোহার ইলেক্‌ট্রনও মিশবে আবার সোনারও।

সেদিনকার দিদিমা পছন্দ করবে না।

আমার ভরসা আছে সেদিনকার আধুনিক নাৎনীরা মুগ্ধ হয়ে যাবে।

তাহোলে সেই আলোর যুগে তোমার নাৎনী হয়েই জন্মাব। এবারকার মতো দেহধারিণীর 'পরে ধৈর্য্য রক্ষা কোরো। এখন চললুম সিনেমায়।

কিসের পালা।

বৈদেহীর বনবাস।

১৪

পরদিন সকালবেলায় প্রাতরাশে আমার নির্দ্দেশ মতো পুপেদিদি নিয়ে এল পাথরের পাত্রে ছোলাভিজে এবং গুড়। বর্ত্তমান যুগে পুরাকালীন গৌড়ীয় খাদ্যবিধির রেনেসাস্ প্রবর্ত্তনে লেগেছি। দিদিমণি জিগেস করলে, চা হবে কি। আমি বললুম, না, খেজুর রস।

দিদি বললে, আজ তোমার মুখখানা অমন দেখছি কেন। কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখেছ না কি।

আমি বললুম, স্বপ্নের ছায়া তো মনের উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করছেই, স্বপ্নও মিলিয়ে যায় ছায়ারও চিহ্ন থাকে না। আজ তোমার ছেলে-মানুষির একটা কথা বারবার মনে পড়ছে—ইচ্ছে করছে বলি।

বলো না।

সেদিন লেখা বন্ধ ক'রে বারান্দায় বসে ছিলুম। তুমি ছিলে, সুকুমারও ছিল। সন্ধে হয়ে এল, রাস্তার বাতি জ্বালিয়ে গেল, আমি বসে বসে সত্যযুগের কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছিলুম।

বানিয়ে বলছিলে। তার মানে ওটাকে সত্যযুগ ক'রে তুলছিলে।

ওকে অসত্য বলে না। যে রশ্মি বেগনির সীমা পেরিয়ে গেছে তাকে দেখা যায় না ব'লেই সে মিথ্যে নয়, সেও আলো। ইতিহাসের সেই বেগ্নি-পেরোনো আলোতেই মানুষের সত্যযুগের সৃষ্টি। তাকে প্রাগ্-ঐতিহাসিক বলব না, সে আলট্রা-ঐতিহাসিক।

আর তোমার ব্যাখ্যা করতে হবে না। কী বলছিলে বলো।

আমি তোমাদের বলছিলুম, সত্যযুগে মানুষ বই প'ড়ে শিখত না, খবর শুনে জান্‌ত না, তাদের জানা ছিল হয়ে-উঠে জানা।

কী মানে হোলো বুঝতে পারছি নে।

একটু মন দিয়ে শোনো বলি। বোধ হয় তোমার বিশ্বাস তুমি আমাকে জানো।

দৃঢ় বিশ্বাস।

জানো কিন্তু সে জানায় সাড়ে পনেরো আনাই বাদ পড়ে গেছে। ইচ্ছে করলেই তুমি যদি ভিতরে ভিতরে আমি হয়ে যেতে পারতে তাহোলেই তোমার জানাটা সম্পূর্ণ সত্য হোত।

তাহোলে তুমি বলতে চাও আমরা কিছুই জানিনে।

জানিইনে তো। সবাই মিলে ধরে নিয়েছি যে জানি, সেই আপোষে ধরে নেওয়ার উপরেই আমাদের কারবার।

কারবার তো ভালোই চলছে।

চলছে, কিন্তু এ সত্যযুগের চলা নয়। সেই কথাই তোমাদের বলছিলুম, সত্যযুগে মানুষ দেখার জানা জান্‌ত না, ছোঁওয়ার জানা জান্‌ত না, জানত একেবারে হওয়ার জানা।

মেয়েদের মন প্রত্যক্ষকে আঁকড়ে থাকে, ভেবেছিলেম আমার কথাটা অত্যন্ত অবাস্তব ঠেকবে পুপুর কাছে—ভালোই লাগবে না। দেখলুম একটু ঔৎসুক্য হয়েছে। বললে, বেশ মজা। একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেই বললে, আচ্ছা দাদামশায়, আজকাল তো সায়ান্সে অনেক বুজরুগী করছে, মরা মানুষের গান শোনাচ্চে, দূরের মানুষের চেহারা দেখাচ্চে. আবার শুনছি শিষেকে সোনা করছে, তেমনি একদিন হয়তো এমন একটা বিদ্যুতের খেলা খেলাবে যে ইচ্ছে করলে একজন আর একজনের মধ্যে মিলে যেতে পারবে।

অসম্ভব নয়। কিন্তু তুমি তাহোলে কী করবে। কিছুই লুকোতে পারবে না।

সর্ব্বনাশ। সব মানুষেরই যে লুকোবার আছে অনেক।

লুকোনো আছে ব'লেই লুকোবার আছে। যদি কারো কিছুই লুকোনো না থাকত তাহোলে দেখা-বিনতি খেলার মতো সবার সব জেনেই লোকব্যবহার হোত।

কিন্তু লজ্জার কথা যে অনেক আছে।

লজ্জার কথা সকলেরই প্রকাশ হোলে লজ্জার ধার চলে যেত।

আচ্ছা আমার কথা কী বলতে যাচ্ছিলে তুমি।

সেদিন আমি তোমাকে জিগেস করেছিলুম, তুমি যদি সত্যযুগে জন্মাতে তবে আপনাকে কী হয়ে দেখতে তোমার ইচ্ছে হোত। তুমি ফস্ ক'রে ব'লে ফেললে, কাবুলি-বেড়াল।

পুপে মস্ত ক্ষাপা হয়ে ব'লে উঠল, কখ্খনো না। তুমি বানিয়ে বলছ।

আমার সত্যযুগটা আমার বানানো হোতে পারে কিন্তু তোমার মুখের কথাটা তোমারই। ওটা ফস্ ক'রে আমি-হেন বাচালও বানাতে পারতুম না।

এর থেকে তুমি কি মনে করেছিলে আমি খুব বোকা।

এই মনে করেছিলুম যে, কাবুলি-বেড়ালের উপর অত্যন্ত লোভ করেছিলে অথচ কাবুলিবেড়াল পাবার পথ তোমার ছিল না, তোমার বাবা বেড়াল জন্তুটাকে দেখতে পারতেন না। আমার মতে সত্যযুগে বেড়াল কিনতেও হোত না পেতেও হোত না, ইচ্ছে করলেই বেড়াল হোতে পারা যেত।

মানুষ ছিলুম বেড়াল হলুম এতে কী সুবিধেটা হোলো। তার চেয়ে যে বেড়াল কেনাও ভালো, না কিনতে পারলে না পাওয়া ভালো।

ঐ দেখো সত্যযুগের মহিমাটা মনে ধারণা করতে পারছ না। সত্যযুগের পুপে আপনার সীমানা বাড়িয়ে দিত বেড়ালের মধ্যে। সীমানা লোপ করত না। তুমি তুমিও থাকতে বেড়ালও হোতে।

তোমার এসব কথার কোনো মানে নেই।

সত্যযুগের ভাষায় মানে আছে। সেদিন তো তোমাদের অধ্যাপক প্রমথবাবুর কাছে শুনেছিলে, আলোকের অণুপরমাণু বৃষ্টির মতো কণা বর্ষণও বটে আবার নদীর মতো তরঙ্গধারাও বটে। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝি, হয় এটা নয় ওটা, কিন্তু বিজ্ঞানের বুদ্ধিতে একই কালে দুটোকেই মেনে নেয়। তেমনি একই কালে তুমি পুপুও বটে বেড়ালও বটে, এটা সত্যযুগের কথা।

দাদামশায় যতই তোমার বয়স এগিয়ে চলছে ততই তোমার কথাগুলো অবোধ্য হয়ে উঠছে তোমার কবিতারই মতো।

অবশেষে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যাব তারই পূর্ব্বলক্ষণ।

সেদিনকার কথাটা কি ঐ কাবুলি-বেড়ালের পরে আর এগোল না।

এগিয়েছিল। সুকুমার এককোণে বসে ছিল, সে স্বপ্নে-কথা-বলার মতো ব'লে উঠল, আমার ইচ্ছে করে শাল গাছ হয়ে দেখতে। সুকুমারকে উপহসিত করবার সুযোগ পেলে তুমি খুসি হোতে। ও শাল গাছ হোতে চায় শুনে তুমি তো হেসে অস্থির। ও চমকে উঠল লজ্জায়। কাজেই ও বেচারীর পক্ষ নিয়ে আমি বললেম—দক্ষিণের হাওয়া দিল কোথা থেকে, গাছটার ডাল ছেয়ে গেল ফুলে, ওর মজ্জার ভিতর দিয়ে কী মায়ামন্ত্রের অদৃশ্য প্রবাহ বয়ে যায় যাতে ঐ রূপের গন্ধের ভোজবাজি চলতে থাকে। ভিতরের থেকে সেই আবেগটা জানতে ইচ্ছা করে বৈ কী, গাছ না হোতে পারলে বসন্তে গাছের সেই অপরিমিত রোমাঞ্চ অনুভব করব কী ক'রে।—

আমার কথা শুনে সুকুমার উৎসাহিত হয়ে উঠল,—বললে, আমার

—পৃঃ ১৪০

শোবার ঘরের জানলা থেকে যে শালগাছটা দেখা যায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার মাথাটা আমি দেখতে পাই, মনে হয় ও স্বপ্ন দেখছে।—

শালগাছ স্বপ্ন দেখছে শুনে বোধ হয় বলতে যাচ্ছিলে, কী বোকার মতো কথা।—বাধা দিয়ে ব'লে উঠলুম, শালগাছের সমস্ত জীবনটাই স্বপ্ন। ও স্বপ্নে চলে এসেছে বীজের থেকে অঙ্কুরে, অঙ্কুর থেকে গাছে। পাতাগুলোই তো ওর স্বপ্নে-কওয়া-কথা।

সুকুমারকে বললুম, সেদিন যখন সকালবেলায় ঘন মেঘ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছিল, আমি দেখলুম তুমি উত্তরের বারান্দায় রেলিং ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিলে। কী ভাবছিলে বলো দেখি।

সুকুমার বললে, জানিনে তো কী ভাবছিলুম।

আমি বললুম, সেই না-জানা-ভাবনায় ভ'রে গিয়েছিল তোমার সমস্ত মন মেঘেভরা আকাশের মতো। সেই রকম গাছগুলো যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওদের মধ্যে যেন একটা না-জানা ভাব আছে। সেই ভাবনাই বর্ষায় মেঘের ছায়ায় নিবিড় হয়, শীতের সকালের রৌদ্রে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই না-জানা ভাবনার ভাষায় কচি পাতায় ওদের ডালে ডালে বকুনি জাগে, গান ওঠে ফুলের মঞ্জরীতে। আজো মনে পড়ে সুকুমারের চোখ দুটো কী রকম এতখানি হয়ে উঠল; সে বললে, আমি যদি গাছ হোতে পারতুম তাহোলে সেই বকুনি সির্‌সির্‌ করে আমার সমস্ত গা বেয়ে উঠত আকাশের মেঘের দিকে। তুমি দেখলে সুকুমার আসরটা দখল ক'রে নিচ্চে। ওকে নেপথ্যে সরিয়ে তুমি এলে সামনে। কথা পাড়লে, আচ্ছা দাদামশায়, এখন যদি সত্য যুগ আসে তুমি কী হোতে চাও। তোমার বিশ্বাস ছিল আমি ম্যাসটোডন কিম্বা মেগাথেরিয়ম হোতে চাইব, কেননা জীব-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের প্রাণীদের সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে এর কিছুদিন আগেই আলোচনা করেছি। তখন তরুণ পৃথিবীর হাড় ছিল কাঁচা, পাকা রকম ক'রে জমাট হয়ে ওঠেনি তার

মহাদেশ, গাছপালা-গুলোর চেহারা ছিল বিশ্বকর্তার প্রথম তুলির টানের। সেইদিনকার আদিম অরণ্যে সেইদিনকার অনিশ্চিত শীতগ্রীষ্মের অধিকারে এই সব ভীমকায় জন্তুগুলোর জীবযাত্রা চলছে কী রকম ক'রে, তা স্পষ্টরূপে কল্পনা করতে পারছে না আজকের দিনের মানুষ এই কথাটা তোমার শোনা ছিল আমার মুখে। পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম অভিযানের সেই মহাকাব্য যুগটাকে স্পষ্ট ক'রে জানবার ব্যাকুলতা তুমি আমার কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলে। তাই আমি যদি হঠাৎ ব'লে উঠতুম, সে কালের রোঁয়াওয়ালা চার দাঁতওয়ালা হাতি হওয়া আমার ইচ্ছে, তাহোলে তুমি খুসি হোতে। তোমার কাবুলিবেড়াল হওয়ার থেকে এই ইচ্ছে বেশি দূরে পড়ত না, আমাকে তোমার দলে পেতে। হয়তো আমার মুখে ঐ ইচ্ছেটাই ব্যক্ত হোত। কিন্তু সুকুমারের কথাটা আমার মনকে টেনে নিয়েছিল অন্যদিকে।

পুপে ব'লে উঠল, জানি, জানি, সুকুমারদার সঙ্গেই তোমার মনের মিল ছিল বেশি।

আমি বললুম, তার একমাত্র কারণ, ও ছিল ছেলে, আমিও ছেলে হয়েই জন্মেছিলুম একদিন। ওর ভাবনার ছাঁচ ছিল আমারই শিশু ভাবনার ছাঁচে। তুমি সেদিন তোমার খেলার হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে ভাবী গৃহস্থালির যে স্বপ্নলোক বানিয়ে তুলে খুসি হোতে সেটা দেখতে পেতুম একটু তফাৎ থেকে। তুমি তোমার খেলার খোকাকে কোলে ক'রে যখন নাচাতে তার স্নেহের রসটা ষোলো আনা পাবার সাধ্য আমার ছিল না।

পুপু বললে,আচ্ছা সে কথা থাক্, সেদিন তুমি কী হোতে ইচ্ছে করেছিলে বলো।

আমি হোতে চেয়েছিলুম একখানা দৃশ্য অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সকালবেলার প্রথম প্রহর, মাঘের শেষে হাওয়া হয়েছে উতলা, পুরোনো অশথ গাছটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে ছেলেমানুষের মতো, নদীর জলে উঠেছে কলরব,

উঁচুনিচু ডাঙায় ঝাপ্‌সা দেখাচ্চে দলবাঁধা গাছ। সমস্তটার পিছনে খোলা আকাশ, সেই আকাশে একটা সুদূরতা,—মনে হচ্চে যেন অনেক দূরের ওপার থেকে একটা ঘণ্টার ধ্বনি ক্ষীণতম হয়ে গেছে বাতাসে, যেন রোদ্দুরে মিশিয়ে দিয়েছে তার কথাটাকে—বেলা যায়—।

তোমার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল একখানা গাছ হওয়ার চেয়ে নদী বন আকাশ নিয়ে একখানা সমগ্র ভূদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কল্পনা তোমার কাছে অনেক বেশি সৃষ্টিছাড়া বোধ হোলো।

সুকুমার বললে, গাছপালা নদী সবটার উপরে তুমি ছড়িয়ে মিলিয়ে গেছ মনে করতে আমার ভারি মজা লাগছে। আচ্ছা, সত্যযুগ কি কোনোদিন আসবে।

যতদিন না আসে ততদিন ছবি আছে কবিতা আছে। আপনাকে ভুলে গিয়ে আর কিছু হয়ে যাবার ঐ একটা বড়ো রাস্তা।

সুকুমার বললে, তুমি যেটা বললে ওটা কি ছবিতে এঁকেছ।

হাঁ এঁকেছি।

আমিও একটা আঁকব।

সুকুমারের স্পর্দ্ধার কথা শুনে তুমি ব'লে উঠলে, পারবে না কি তুমি আঁকতে।

আমি বললুম, ঠিক পারবে। আঁকা হয়ে গেলে ভাই তোমারটা আমি নেব আমারটা তোমাকে দেব।

সেদিন এই পর্য্যন্ত হোলো আমাদের আলাপ।

এইবার আমাদের সেদিনকার আসরের শেষ কথাটা ব'লে নিই। তুমি চলে গেলে তোমার পায়রাকে ধান খাওয়াতে। সুকুমার তখনো বসে বসে কী ভাবতে লাগল। আমি তাকে বললুম, তুমি কী ভাবছ বলব।

সুকুমার বললে, বলো দেখি।

তুমি ভেবে দেখছ আরো কী হয়ে যেতে পারলে ভালো হয়, হয়তো প্রথম মেঘকরা আষাঢ়ের বৃষ্টিভেজা আকাশ, হয়তো পূজোর ছুটিতে ঘরমুখো পাল-তোলা পান্সি নৌকোখানি। এই উপলক্ষ্যে আমি তোমাকে আমার জীবনের একটা কথা বলি। তুমি জানো ধীরুকে আমি কত ভালোবাসতুম। হঠাৎ টেলিগ্রামে খবর পেলুম তার টাইফয়েড, সেই বিকেলেই চলে গেলুম মুন্সিগঞ্জে তাদের বাড়িতে। সাতদিন সাতরাত কাটল। সেদিন ছিল অত্যন্ত গরম, রৌদ্র প্রখর। দূরে একটা কুকুর করুণ সুরে আর্ত্তনাদ করে উঠছিল— শুনে মন খারাপ হয়ে যায়। বিকেলে রোদ পড়ে আসছে, পশ্চিম দিক থেকে ডুমুর গাছের ছায়া পড়েছে বারান্দার উপরে। পাড়ার গয়লানী এসে জিগেস করলে, তোমাদের খোকাবাবু কেমন আছে গা। আমি বললুম, মাথার কষ্ট গা জ্বালা আজ কমেছে। যারা সেবা করছিল তারা আজ কেউ কেউ ছুটি নেবার অবকাশ পেলে। দুজন ডাক্তার রুগী দেখে বেরিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ ক'রে কী পরামর্শ করলে; বুঝলেম আশার লক্ষণ নয়। চুপ ক'রে ব'সে রইলুম, মনে হোলো, কী হবে শুনে। সায়াহ্নের ছায়া ঘনিয়ে এল। দেখা গেল সামনের মহানিম গাছের মাথার উপরে সন্ধ্যাতারা দেখা দিয়েছে। দূরের রাস্তায় পাট-বোঝাই গোরুর গাড়ির শব্দ আর শোনা যায় না। সমস্ত আকাশটা যেন ঝিমঝিম করছে। কী জানি কেন মনে মনে বলছি, পশ্চিম আকাশ থেকে ঐ আসছে রাত্রিরূপিনী শান্তি, স্নিগ্ধ, কালো, স্তব্ধ। প্রতিদিনই তো আসে কিন্তু আজ এল বিশেষ একটি মূর্ত্তি নিয়ে স্পর্শ নিয়ে, চোখ বুজে সেই ধীরে চলে-আসা রাত্রির আবির্ভাব আমার সমস্ত অঙ্গকে মনকে যেন আবৃত করে দিলে। মনে মনে বললুম, ওগো শান্তি, ওগো রাত্রি, তুমি আমার দিদি, আমার অনাদি কালের দিদি, দিন অবসানের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে টেনে নাও তোমার বুকের কাছে আমার ধীরুভাইকে, তার সকল জ্বালা যাক্ জুড়িয়ে একেবারে।

দুই পহর পেরিয়ে গেল; একটা কান্নার ধ্বনি উঠল রোগীর শিয়রের

কাছ-থেকে ; নিস্তব্ধ রাস্তা বেয়ে গেল চলে ডাক্তারের গাড়ি তার ঘরে ফিরে। সেদিন আমার সমস্ত মন-ভরা একটি রাত্রির রূপ দেখেছি, আমি তাতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলুম, পৃথিবী যেমন তার স্বাতন্ত্র্য মিলিয়ে দেয় নিশীথের ধ্যানাবরণে।

—কী জানি, সুকুমারের কী মনে হোলো সে অধীর হয়ে ব'লে উঠল, আমাকে কিন্তু তোমার ঐ দিদি অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অমন চুপি চুপি নিয়ে যাবে না। পূজোর ছুটির দিনে যেদিন সকালে দশটা বাজবে, কাউকে ইস্কুলে যেতে হবে না, ছেলেরা সবাই যেদিন গেছে রথতলার মাঠে ব্যাটবল খেলতে, সেইদিন আমি খেলার মতো ক'রেই হঠাৎ মিলিয়ে যাব আকাশে, ছুটির দিনের রোদ্দ্যুরে।—শুনে আমি চুপ করে রইলুম, কিছু বললুম না।

* * * * * *

পুপেদিদি বললে, কাল থেকে সুকুমারদা'র কথা তুমি প্রায়ই বলছ। তার মধ্যে আমার উপরে একটুখানি খোঁচা থাকে। তুমি কি মনে করো তোমার ভালোবাসার অংশ নিয়ে সুকুমারদা'র সঙ্গে আমার ছেলেবেলাকার যে ঝগড়া ছিল সেটা এখনো আছে।

হয়তো একটুখানি আছে বা। সেইটেকে একেবারে ক্ষইয়ে দেব ব'লেই বারবার তার কথা তুলি। আরো একটুখানি কারণ আছে।

কী কারণ বলোই না।

কিছুদিন আগে সুকুমারের বাবা ডাক্তার নিতাই এসেছিলেন আমার কাছে বিদায় নিতে।

কেন, বিদায় নিতে কেন।

তোমাকে বলব মনে করেছিলুম বলা হয়নি। আজ বলি। নিতাই চাইলে সুকুমার আইন পড়ে, সুকুমার চাইলে সে ছবি আঁকা শেখে নন্দলাল-বাবুর কাছে। নিতাই বললে, ছবি আঁকা বিদ্যেয় আঙুল চলে পেট চলে না।

সুকুমার বললে আমার ছবির ক্ষিদে যত, পেটের ক্ষিদে তত বেশি নয়। নিতাই কিছু কড়া ক'রে বললে, সে কথাটা তোমার প্রমাণ ক'রে দেবার দরকার হয়নি, পেট সহজেই চলে যাচ্চে। কথাটা বিশ্রী লাগল তার মনে—কিন্তু হেসে বললে, কথাটা সত্যি, এর প্রমাণ দেওয়া উচিত।—বাবা ভাবলে এইবার ছেলে আইন পড়তে বসবে। সুকুমারের বরিশালের মাতামহ ক্যাপা গোছের মানুষ, সুকুমারের স্বভাবটা তাঁরই ছাঁচের, চেহারারও সাদৃশ্য আছে। দুজনের পরে দুজনের ভালোবাসা পরম বন্ধুর মতো। পরামর্শ হোলো দুজনে মিলে—সুকুমার টাকা পেল কিছু, কখন চলে গেল বিলেতে কেউ জানে না। বাবাকে চিঠি লিখে গেল, আপনি চান না আমি ছবি আঁকা শিখি, শিখব না। আপনি চান অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করব, তাই করতে চললুম। যখন সমাপ্ত হবে প্রণাম করতে আসব, আশীর্ব্বাদ করবেন।

কোন্ বিদ্যে শিখতে গেল কাউকে বলে নি। একটা ডায়ারি পাওয়া গেল তার ডেস্কে। তার থেকে বোঝা গেল সে য়ুরোপে গেছে উড়ো জাহাজের মাঝিগিরি শিখতে। তার শেষদিকটা কপি ক'রে এনেছি। ও লিখছে—

মনে আছে একদিন আমার ছত্রপতি পক্ষীরাজে চ'ড়ে পুপুদিদিকে চন্দ্রলোক থেকে উদ্ধার করতে যাত্রা করেছিলুম আমাদের ছাদের একধার থেকে আর এক ধারে। এবার চলেছি কলের পক্ষীরাজকে বাগ মানাতে। য়ুরোপে চন্দ্রলোকে যাবার আয়োজন চলেছে। যদি সুবিধা পাই যাত্রীর দলে আমিও নাম লেখাব। আপাতত পৃথিবীর আকাশ-প্রদক্ষিণে হাত পাকিয়ে নিতে চাই। একদিন আমি তার দাদামশায়ের দেখাদেখি যে ছবি এঁকেছিলুম, দেখে পুপুদিদি হেসেছিল। সেইদিন থেকে দশ বছর ধরে ছবি আঁকা অভ্যাস করেছি কাউকে দেখাইনি। এখনকার আঁকা দুখানা ছবি রেখে গেলুম পুপের দাদামশায়ের জন্যে। একটা ছবি জলস্থল আকাশের একতান সঙ্গৎ নিয়ে, আর একটা আমার বরিশালের দাদামশায়ের। পুপের দাদামশায় ছবি দুটো দেখিয়ে

পুপেদিদির সেদিনকার হাসি যদি ফিরিয়ে নিতে পারেন তো ভালোই, নইলে যেন ছিঁড়ে ফেলেন। আমার এবারকার যাত্রায় চন্দ্রলোকের মাঝপথেই পক্ষীরাজের পাখা ভাঙা অসম্ভব নয়। যদি ভাঙে তবে এক নিমেষে সত্য-লোকে পৌঁছব—সূর্য্য প্রদক্ষিণের পথে একেবারে মিলে যাব পৃথিবীর সঙ্গে। যদি বেঁচে থাকি, আকাশের খেয়া-পারাপারে যদি নৈপুণ্য ঘটে তাহোলে একদিন পুপুদিদিকে নিয়ে শূন্য পথে পাড়ি দিয়ে আসব মনে এই ইচ্ছে রইল। সত্যযুগে বোধ হয় ইচ্ছে আর ঘটনা একই ছিল। চেষ্টা করব ধ্যানযোগে ইচ্ছেকেই ঘটনা ব'লে ধরে নিতে। ছেলেবেলা থেকে অকারণে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমার অভ্যাস। ঐ আকাশটা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ যুগের কোটি কোটি ইচ্ছে দিয়ে পূর্ণ। এই বিলীয়মান ইচ্ছেগুলো বিশ্বসৃষ্টির কোন্ কাজে লাগে কী জানি। বেড়াক্ উড়ে আমার দীর্ঘনিঃশ্বাসে উৎসারিত ইচ্ছেগুলো সেই আকাশেই, যে আকাশে আজ আমি উড়তে চলেছি।

পুপুদিদি ব্যাকুল হয়ে উঠে জিগেস করলে, সুকুমারদার এখনকার খবর কী।

আমি বললুম, সেইটেই পাওয়া যাচ্চে না ব'লেই তার বাবা বিলেতে সন্ধান করতে চলেছেন।

বিবর্ণ হয়ে গেল দিদির মুখ। আস্তে আস্তে উঠে ঘরে দরজা বন্ধ করে দিলে।

আমি জানি সুকুমারের আঁকা সেই ছেলেমানুষি পুপুদিদি আপন ডেস্কে লুকিয়ে রেখেছে।

আমি চষমাটা মুছে ফেলে চলে গেলুম সুকুমারদের বাড়ির ছাদে। সেই ভাঙা ছাতাটা সেখানে নেই, নেই সেই আতসবাজির আধপোড়া কাঠি।